জনসাধারণের রুচি

বিষ্ণু দে

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর, ১৯৬৫

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
৭৯।১বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর :
গোপালচন্দ্র রায়
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
গৌতম রায়

দশ টাকা

এই বই-এর কিছু লেখা পুস্তকাকারে গ্রথিত হল এই প্রথম, পাঠকগণের উৎসাহে।

বন্ধুবর হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-কেই উৎসর্গ করছি— আমাদের উভয়ের পরলোকগত বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিতে।

বিষ্ণু দে

২।১২।৫৫

কবির অন্যান্য
কাব্যগ্রন্থ

চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবী
ঈশাবাস্য দিবানিশা
স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যত
বছর পঁচিশ

সূচীপত্র

জনসাধারণের রুচি

"যাকে এক ভঙ্গীতে আকস্মিক বা এলোমেলো ঘটনা মনে হয়, আবেক দিব থেকে তাই স্ট্যাটিস্‌টিকাল বা সংখ্যাবিজ্ঞানেব নিয়মে প্রকাশিত।

নিউটনীয় বিজ্ঞানের স্বয়ম্ভবতা ও স্বাধীনতার অতিমাত্রা এখন সমষ্টি জীবযো: ঘটনাবলীর পর্যালোচনায় রূপান্তবিত।······যুদ্ধেব আগে থেকেই উদ্ভাবনীতিব ভাববাদীয় বিজ্ঞানেব চিত্র কল্পনাবিলাসে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীন বৈজ্ঞানিক প্রা: লুপ্ত জীববিশেষ।"

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ একবাব নিখিল ভাবতীয় সংখ্যাবিজ্ঞানেব সম্মেলনে বলেছিলেন যে বিজ্ঞানেব সত্য যেমন একহিসাবে সংখ্যাবিজ্ঞানেব সাহায্যে সমীকৃত তত্ত্ব, তেমনি সংখ্যাবিজ্ঞানেব তথ্যপ্রমাণ রসদ জোগায় আধুনিক মানুষে: উন্নতির পরিকল্পনায়। ভাবতীয় সংখ্যাবিজ্ঞানাগাব এরই মধ্যে, ১৯৩৫-৬ থেকে ১৯৪২-৪ অবধি প্রায় ১১৫৯ তথ্যানুসন্ধান এবং নানাবিধ বড়ো শুমারের কাজ করেছে। দেশের লোকেব মধ্যে এ কাজেব গুরুত্ববোধ কেন এত কম জানি না। বিজ্ঞানাগাব অবশ্যই ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান নয়, ফলে তাব আত্মসম্মা: প্রচারকার্যেব উঞ্ছবৃত্তিতে শেষ য় না। কিন্তু আশা কবা যায় অদূব ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় নৈরাশ্য কমবে আব বৈজ্ঞানিক মনোভাব বৃদ্ধি পাবে এবং সংখ্যাবিজ্ঞানেব সাহায্য আমরা নানাদিকে গ্রহণ করতে পারব। তথ ও তথ্য, জীবন ও বিজ্ঞানেব ভিত্তিতেই এ বিজ্ঞানেব কাজ, প্রত্যক্ষে: সমস্যায় এখানে রাশি-প্রত্যয়েব কূটচর্চা হয়। বলাবাহুল্য, আমরা বিজ্ঞানে: অর্থে বিদ্যালয়ের নিরালম্ব মৃত ও নিরাপদ জ্ঞান বুঝি না। জে ডি বার্নলের ভাষায় বহুকাল হল বিজ্ঞানেব সীমা প্রসারিত। বিজ্ঞান এখন হয়েছে উপাদানযন্ত্রের ও কৃষির একাত্ম অংশ। স্বাস্থ্যের নিয়ন্ত্রণে এর হাত, ব্যবসা: ব্যাঙ্ক অফিসে সরকারী কাজেও বিজ্ঞানের নির্দেশ। বিজ্ঞানের বিধিব্যবস্থাগুলি আর মনোনীত ভাবগুলিই একালের চিন্তা ও কর্মধারার রূপ নির্ণয় করে।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় সংখ্যাবিজ্ঞানাগারের অনুসন্ধান ও শুমারির যে তালিকা পাওয়া যায়, তাতে এই ব্যবহারিক সার্থকতা স্পষ্ট হবে, ১৯৪১-এ অনুসন্ধানের মধ্যে কৃষি সমস্যা ৮১, নৃতত্ত্ব ৩, অর্থশাস্ত্র, ৩০, শিক্ষা ১৭, বন ৭, যন্ত্রশিল্প ১১, গণিত ১২, স্বাস্থ্য ২০, আবহতত্ত্ব ও জলসেচন ১৪ এবং অন্যান্য বিষয় ২০ টি ছিল।

শুধু ব্যবহারিক সার্থকতা ধরলে নিঃসন্দেহ অন্যায় করা হবে। মহলানবিশের নেতৃত্বে সমীকৃত বিস্তার নিছক বৈজ্ঞানিক অবদান, নমুনা শুমারের পদ্ধতির বিকাশও বিজ্ঞানজগতে কলকাতার দান। আজকে শুধু জনসাধারণের রুচি-সন্ধানে যে তিনটি শুমারি হয়েছিল, সাহিত্যের সামাজিক ঝোঁকে তার বিশেষ দাম ব'লে সে বিষয়ে সামান্য কিছু আলাপ করা যাক।

২

প্রথমত, এ রকম কাজ যখন জড় প্রকৃতিতে সন্ধান হয়, তখন যেমন নিছক বৈজ্ঞানিক তথ্যই সন্ধানীর উপজীব্য হয়, তেমনি ব্যক্তি বা মানুষের সমাজঘটিত সন্ধানে একটি মূল্যস্বীকার আরম্ভেই করণীয়। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ১৯৪১ সালে মডর্ন রিভিউতে জনরুচি বিষয়ে প্রবন্ধে এই পুরুষার্থ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ব্রাইসের মতো সকলকেই মানতে হয় যে অতি দীর্ঘকাল স্বীকার বা অস্বীকারের মধ্যে দিয়ে মানবসমাজ জনসাধারণের অধিকার কিছুতেই ভুলতে পারে নি। পারে নি বলেই তাকে গ্রীসে দাসপ্রথা গড়তে হয়েছে, ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রমের বিস্মৃতিকৌশল তৈরি করতে হয়েছে। কালস্রোতে ভেসে যায় সবই, শুধু থাকে জনসাধারণ, মৃত্যুহীন নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিসমষ্টি।

এ কথা স্বীকারের পরে জনসাধারণের সাধারণ্য সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি হবে না। এবং এই আর্যসত্যের উপরে সংখ্যাবিজ্ঞানের নমুনা-শুমারের ভিত্তি। দশহাজারের ভিড়ে তাই দুশো লোকের মন্তব্য শুনলেই রিপোর্ট যথাযথ লেখা সম্ভব। কথা উঠবে সাংবাদিকের দলীয় দৃষ্টি যাবে কোথা? আর, ঐ দুশো লোক হয়তো হবে এককোণে ভিড় ক'রে ব'সে একটি দল। প্রতিকার সহজ। প্রথম কথা, একজন মাত্র সাংবাদিকের একপেশে মন্তব্য এখানে মানছি না, মানছি বিশজনের ভিন্ন দৃষ্টি, পরস্পরকে কাটাকুটি ক'রে যেটা একটা ভারসাম্য পায়। তাছাড়া আছে সতর্ক হিসাবের ছক, যাতে একই জিজ্ঞাসায় বিশ জন লোক বিশটি

এলাকায় বা আলাদাভাবে চল্লিশটি এলাকায় ঘুরবে। স্বেচ্ছায় নয়, অতিসতর্ক ছকের নির্দিষ্ট এলোমেলো হিসাবে। কথাটা উঠবে, ঐখানে এলোমেলো কি হিসাবে প্রতিনিধি? কাপড়ের নমুনা যে হিসাবে, এক চুপ্‌ড়ি আমের উপরে নিচে এপাশে ওপাশে যে কোনো পাঁচটা যে হিসাবে। পক্ষপাত-সম্ভাবনা দূর করবার জন্যই এলোমেলো বাছাই।

১৯৪১-এ জনরুচি শুমারে তিনটি ভাগ করা হয়েছিল—

(ক) থ্যাকারের রাস্তার নির্ঘণ্ট থেকে কলকাতায় খাপছাড়াভাবে বাছাই করা হয় ১৫০৩টি পরিবার বিস্তৃত প্রশ্নমালার উত্তরের জন্য।

(খ) অল্‌-ইণ্ডিয়া রেডিওর সাহায্যে ৮৩০জন রেডিও লাইসেন্সী ধরা হয় এক নম্বর সাধারণ শুমারের এলাকা থেকেই। তাতে ফলাফলের তুলনা করা সম্ভব হয়েছিল।

(গ) হ্যারিসন ও ম্যাজ্‌ প্রবর্তিত বিলেতি ম্যাস অবসর্ভেশন ধরনে-ব্যক্তিগত প্রশ্ন ও আলাপের মধ্যে দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল মুখ্যত মিত্রশক্তি, নিরপেক্ষ (১৯৪১ সালে নিরপেক্ষের সংখ্যা কিছু ছিল, সুইডেন তুর্কী ও স্পেন ছাড়াও, যারা বোধ হয় আগামী বৎসরে মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদান করবে।) এবং অক্ষশক্তির বেতারবার্তা বিষয়ে এতে কলকাতায় ৩৮৬ জন লোক পরীক্ষা করা হয় এবং জগদ্দলে ১০১ জন। দ্বিতীয় শুমারে কলকাতা ছাড়া জগদ্দল এবং আসানসোলেও গণনা হয়েছিল।

৩

সংস্থানের দিকে, কলকাতায় সমস্ত ক্ষেত্রটি দুটি ভূগোল-এলাকায় বা মহলে ভাগ করা হয় এবং খবর আনেন প্রতি মহল থেকে তিনটি ভিন্ন সন্ধানী দল। ফলে একই মহল থেকে তিনটি স্বাধীন তথ্যের ত্রিবেণী পাওয়া যায় এবং সমস্ত ক্ষেত্রটাতে তাই খানিকটা ব্যক্তিনিরপেক্ষ ফলাফল সংগ্রহ করা যায়।

একচল্লিশের ২৩শে মার্চ রেডিও লাইসেন্সের ফর্দ লেবরেটরিতে পৌঁছায়। দু' সপ্তাহ কাটে নমুনার পদ্ধতিটা ঠিক করতে, অনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিবারগুলি আর লাইসেন্সীদের বাছাই, এবং ক্ষেত্রকার্যের ছক তৈরি করতে। ১৬ই এপ্রিল তথ্যসংগ্রহ আরম্ভ ও ছয় সপ্তাহে শেষ হয়। ফেব্রুয়ারী মার্চে ছোটখাটো সংগ্রহের পরীক্ষা করে দেখা হয় পুরোসময়ের কর্মী দিয়ে। তারপরে চেষ্টা করা

হয় বাইরের স্বেচ্ছাকর্মীর সাহায্য নেবার। দুটোর কোনোটাই সুবিধা না হওয়ার কাজ ও অর্থব্যয় বিবেচনার পর শেষে লেবরেটরির কর্মীদেরই খণ্ডকর্মী হিসাবে প্রয়োগ করা স্থির হয়। বিবেচনা করেই কর্মীর সংখ্যা বেশী করা হয়েছিল : কলকাতায় জনপঞ্চাশেক, জগদ্দলে ৫ জন, আসানসোলে ৪ জন। সংখ্যাধিক্যের একটা সুবিধা হচ্ছে তথ্যসংগ্রাহকদের ব্যক্তিগত মতামতের পক্ষপাত এতে পরস্পরকে নাকচ করে। তাছাড়া বেশি লোকের কাজটা জানা হয়ে থাকে, যাতে করে ভবিষ্যতে যোগ্যতরদের বেছে নেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নতালিকার উত্তর সংগ্রাহকেরা লিখেছেন পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা ক'রে। এই উত্তরই ব্যবহার করা হয়েছে যদিচ একই পারিবারে ইচ্ছুক অন্য ব্যক্তিদেরও উত্তর সংগ্রহ করা হয়েছিল, সে পারিবারিক তুলনা এ কাজের বাইরে। ইতিমধ্যে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে জনতানিরীক্ষার কর্মী বাছাই করা হয় সাধারণ বুদ্ধি ও শিক্ষা, নির্ভরযোগ্যতা, বিবেচনা ও সামাজিকতা ইত্যাদির দিক থেকে। এ কাজ কলকাতায় করেন আংশিক সময়ের কর্মী ২২ জন জগদ্দলে পুরো সময়ের একজন। মে-র শেষ সপ্তাহে ও জুনের প্রথমে এ নিরীক্ষা সমাধা হয়।

তখনকার বড়ো খবর ছিল রুডল্‌ফ্ হেসের ইংলণ্ডে অবতরণ এবং জার্মানির সঙ্গে ভিশি-র বশ্যতাব্যবস্থা। বল্কান্ অঞ্চলে তখন জর্মান জয়যাত্রা। স্বদেশে তখনো সাতটি প্রদেশে লাটের শাসন চলছিল এবং কংগ্রেসের দাবিদাওয়া মেটে নি। তারপরে যুগোশ্লাভিয়ার পতন, আফ্রিকায় মিত্রশক্তির সাফল্য, ইরাকে গোলমাল ও তৈলনলপথের ইংরেজের অধিকার, স্টালিনকে প্রধানমন্ত্রীপদে আরোপ, ক্রীটের যুদ্ধ, এবং এপক্ষে হুড ওপক্ষে বিসমার্ক জাহাজ ডুবি। পাট আর আখের পোকার দুটি বিপুল শুমারির মধ্যে লেবরেটারির কর্মীদের এ কাজ করতে হয়েছিল, সে হিসাবে কাজটা বেশ দ্রুত বলতে হয়।

মোটামুটি, নমুনাগুলি মধ্যবিত্তশ্রেণীতেই আবদ্ধ রাখা হয়েছিল, কারণ বেশীর ভাগ কর্মীই শুধু এই শ্রেণীর পরিচয় রাখতেন। তাছাড়া এই শ্রেণীই জিজ্ঞাসার প্রধান বিষয়। খবর নেওয়া হয়েছিল নিম্নোক্ত বিষয়ে : মেয়ে কি পুরুষ, বয়স ; অবিবাহিত, বিবাহিত, বিপত্নীক বা বিধবা ; ধর্ম ; মাতৃভাষা ; শিক্ষা ; জীবিকা বা কাজ ; এবং আর্থিক অবস্থা,—শেষেরটি রোজগার কতো এ অপ্রতিভ প্রশ্নের বদলে মাসিক সংসার খরচার হিসাব। রেডিও রিপোর্টে বিশেষ ক'রে লিঙ্গ, বয়স, শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা এবং জীবিকার কি প্রভাব পছন্দ অপছন্দ নির্দিষ্ট

করে, সে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হয়। অক্ষশক্তি মিত্রশক্তি ও নিরপেক্ষ শক্তির যুদ্ধের বেতার সংবাদে রুচিভেদ আলোচনায় ধর্ম, ভাষা এবং প্রদেশও বিচার্য।

৪

রিপোর্ট থেকে সামান্য কিছু তথ্য-আলোচনা হয়তো পাঠকদের ধৈর্য চ্যুতি করবে না।

প্রথমে রেডিও ও দৈনিক সংবাদ ধরা যাক। কলকাতায় সংবাদে অনুরাগ দেখা গেল পুরুষের মধ্যে শতকরা ৯১, মেয়েদের মধ্যে ৮৬। শুধু রেডিও থেকে সংবাদ পান পুরুষ শতকরা ৩৫, মেয়ে ৪৪। খবরের কাগজ থেকে সংবাদ পান পুরুষ শতকরা ৬০, মেয়ে ৩৯। আর্থিক হিসাব এখানেও খাটে। ৪০টাকা মাস খরচার দলে রেডিও সংবাদ শোনেন শতকরা ১৭ এবং ৪০০ টাকার উপরের ভদ্রলোকেরা শতকরা ৪১। খবরের কাগজে খবর চান পুরুষ ৭১, মেয়ে ৩৫। সবসুদ্ধ রেডিও শোনেন মেয়ে শতকরা ৩৬·৪ এবং পুরুষ মোটে ১৯·৬। তেমনি আবার কখনও রেডিও শোনেন না, এমন মেয়ে শতকরা ৩৬·৪ আর পুরুষ ১৯·৪। মেয়েদের গার্হস্থ্যই অবশ্য এই দুয়ের কারণ। এখানে বলা ভালো যে, সাধারণ রুচিশুমারের প্রশ্নমালার একটি হচ্ছে, রেডিও নিজের ঘরে, পথে বা দোকানে— কোথায় শোনেন। মোহনবাগান-ঈস্টবেঙ্গল খেলার খবর শ্রবণরত ভিড় পথে ঘাটে দোকানের সামনে সন্ধ্যাবেলার সাধারণ দৃশ্য। বলাই বাহুল্য, কম মেয়েই বাড়িতে রেডিও না থাকলে বাড়ির বাইরে গিয়ে রেডিও শোনেন। আর গল্পগুজব থেকে সংবাদ পান—শতকরা ১৯·৪ অন্তঃপুরিকা, ম্যাট্রিক পূর্ব ২২·২, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শতকরা ২০·৫ এবং চল্লিশ টাকার তলায় ১৮·৪। বয়সের সঙ্গে রেডিও সংবাদে আবেদন কমে,—শোনায় ও চাহিদায় দুয়েই, যেমন বৃদ্ধি পায় আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে।

৫

এবারে রেডিও ও আমোদপ্রমোদ ধরা যাক্‌। রেডিও, সিনেমা, গ্রামোফোন এই তিন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। রেডিওর কপালে পুরুষ শতকরা ৪৬·৭ এবং মেয়ে ৫১·১ পাওয়া গেল, প্রায় এক-তৃতীয়াংশের সিনেমায় যাতায়াত আছে এবং

গ্রামোফোনের শ্রোতা মাত্র শতকরা ১৭·৮। অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও-র প্রমোদশক্তি এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে না; চাকুরিয়া গৃহস্থের সকাল-সন্ধ্যা খানিকটা গার্হস্থ্য-জড়িত, খানিকটা বিশ্রামঘটিত অভ্যাস। এ হিসাবে রেডিও-র আরো চল্‌তি হওয়া উচিত। না হওয়ার বড়ো কারণ ভারতীয় দারিদ্র্য। এবং নিশ্চয়ই ইওরোপীয় অর্থে, একটি দম্পতির সাংসারিক সম্পূর্ণতা আমাদের দেশে এই সবে আসছে। এখনও ভারতবর্ষে ব্যক্তির স্বয়ম্ভরতা জাতীয় অভ্যাসে দাঁড়ায় নি, একদিকে যেমন আমাদের পাবলিক জীবন ব্যক্তিগত, তেমনি অন্যদিকে প্রাইভেট জীবন পুরানো পঞ্চায়েৎ আর একান্নবর্তিতার জেরে আত্মীয় কুটুম্বের প্রতাপে প্রায় প্রকাশ্য বললেই হয়।

সেই জন্যই কি গৃহকর্তার কর্তৃত্বের সুযোগে রেডিওর ব্যবহার বয়সের সঙ্গে বেড়ে চলে? কারণ টেব্‌লে মাননির্ঘণ্টে দেখা যায় যে শিক্ষার তারতম্যে এখানে প্রায় কিছুই আসে যায় না। সিনেমার প্রায় সমান চল্‌তি সব শ্রেণীতে। গ্রামোফোনের দুর্গতিতে দুঃখ লাগ্‌লেও অবাক্ হই নি। গৃহস্থের স্বাধীন উপভোগ বর্তমান লেখক ও তার অনেক বন্ধুদের কাছে গ্রামোফোনেই সম্ভব, পছন্দ-সই ভালো রেকর্ড বাজারে পাওয়া যায় প্রচুর, শুদ্ধ ভারতীয় সংগীত আর তার চেয়ে অনেক বেশি ইওরোপীয় সংগীতের। কিন্তু এখানে দেখা যায় মনিহারি দোকানদার প্রভৃতি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী-জগতে গ্রামোফোনের সব চেয়ে খাতির—শতকরা ২৬।

আবার যদি শোনা আর শুনতে চাওয়ার তুলনা ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে—বয়স, শিক্ষা অর্থ বা কর্মস্থানে নির্বিশেষে আরো বেশি সিনেমা যাবার এবং কম গ্রামোফোন ব্যবহারের বাসনা সুলভ। অভ্যাস নয়, পছন্দের দিক থেকে সিনেমাই রেডিওর চেয়ে জনপ্রিয় বলা যায়।

৬

রেডিওর নমুনা-শুমারের বিষয়ে কিছু বলা দরকার। সে সময়ের রেডিও আর্টিস্টদের পুরো তালিকা দেওয়া হয় প্রশ্নপত্রের এক পিঠে, অন্য পিঠে নানা দফায় প্রশ্ন ছিল। যথা, রবীন্দ্রসংগীত, আধুনিক সংগীত, বক্তৃতা, ওস্তাদী সংগীত, যন্ত্রসংগীত, নাটক ইত্যাদি। "প্রায়ই" শোনেন, না কি "মধ্যে মধ্যে" শোনেন, "কদাচিৎ" বা "কখনো নয়"। তাছাড়া, দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল "আরো

বেশি" না "আরো কম" শুনতে চান। প্রশান্তবাবু ১৮ দফায় প্রশ্নগুলির বিচার করেছেন। সংক্ষেপে।

যুদ্ধের খবর শতকরা		৭৭.৪
মন্তব্য	"	৭৪.৪
আধুনিক সংগীত	"	৭৮.৪
রবীন্দ্র "	"	৭৪.৪
যন্ত্র "	"	৭৩.৪
নাটক	"	৬৮.৮
ধর্ম সংগীত	"	৬৬.৩
ওস্তাদী-সংগীত	"	৩৫.১-ব্যক্তি শোনেন।

অবশ্য এর মধ্যে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। ভিন্ন লোকের ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব, যেমন সম্ভব দিনক্ষণের প্রভাব। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় সব সময়ে সব দফা থাকে না, তাতে শোনার সুবিধা অসুবিধা নিশ্চয়ই করে বাড়ে। নাকট যদি দুপুরে দেওয়া হত, তাহলে শ ৬৮.৮ গৃহস্থেরা ঘুম বাদতক দিয়ে আর চাকুরিয়ারা অফিস কামাই ক'রে, কলকাতা বেতারের বিখ্যাত নাটক বা সংগীতের ইতিহাসে কলকাতার কিম্ভূত সৃষ্টি "আধুনিক ভাবগীতি" শুনতেন কিনা সন্দেহ। গ্রাম্য সংগীত, শিশু ও মহিলা আসর, সংগীত শিক্ষা আর গ্রামার্থে অনুষ্ঠানগুলি যে কলকাতায় এত অপ্রিয়, তার মধ্যেও নিশ্চয় এ দুই কারণ বর্তমান। বোঝা শক্ত, সংগীতশিক্ষা কার উদ্দেশ্যে? তাছাড়া আমাদের নমুনায় শিশু, মহিলা ও গ্রাম'জন কমই ছিল। তবে রেডিও কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা, থেকে থেকে রেডিও অফিসে রাজ-বংশের পরিবর্তন, বা তাঁদের বন্ধুবৎসলতা এ সবই নমুনা-শুমারের বাইরের ব্যাপার। তথ্যসংগ্রহে বৈচিত্র্যের পক্ষপাত নেই।

তাছাড়া অর্থের নানা দিক ধর্তব্য। বয়সের তারতম্যে রুচির পরিবর্তন লক্ষণীয়। আধুনিক সংগীত শতকরা ৭০.৮ থেকে পঞ্চাশোর্ধ্বে ১২.২-তে পরিণত হয়, রবীন্দ্রসংগীত ৬৬.৬ থেকে ২১.২। কিন্তু ভক্তির দাম বয়সে বাড়ে, ধর্ম সংগীত ২৫.০ থেকে ৫১.৫-তে ওঠে। ওস্তাদী গান আঠারো বছরের কনিষ্ঠদের মধ্যে শ্রোতা পায় শতকরা ১৬.৭, উনিশ থেকে পঁচিশ বছরের যৌবনে পায় ২৯.৯ এবং পঁয়ত্রিশের মধ্যে বয়সে নেমে যায় ১২.১-এ। যাকে রেডিও স্টেশনে তাঁরা হাস্যকৌতুক বলেন, সে দফা শতধারা ক্লিওপেট্রার মতোই বয়সে শুকোয় না।

শিক্ষার সঙ্গে স্বভাবতই বক্তৃতাগুলির আদর বাড়ে। আধুনিক সংগীত ও রবীন্দ্র সংগীত ক্ষুদ্র-ব্যবসায়ী-সমাজে যথাক্রমে বেশি ও কম এবং বৃত্তিজীবী সমাজে কম ও বেশি, চলে। মেয়েরা যে এত বেশি ঘরে ব'সে সাপ্তাহিক নাটক শোনেন,—তার কারণ অবশ্য বাংলা-ভাষায় রেডিও-নাট্যের উন্নতি নয়।

৭

রিপোর্টে যথার্থই বলা হয়েছে, আমাদের দেশে নৈরাশ্য এত গভীর যে অনেকেই কম-বেশি চাহিদার দফায় নিরুৎসাহ। সবই যেন কলকাতা কর্পোরেশনে নির্বাচন-প্রতিশ্রুতি, কিন্তু এই ভোট না-দেওয়ার ব্যাপারেও বৈশিষ্ট্য আছে। অর্ধেকের বেশি লোক সংবাদ ও মন্তব্য বিষয়ে চাহিদার কম-বেশি জানিয়েছেন, মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ইত্যাদি আলাপ বিষয়ে মতামত দিয়েছেন, শতকরা ৭০-এর বেশি লোকের রেডিওর শিশু, মহিলা আর গ্রাম্যজন অনুষ্ঠান বিষয়ে কোনো উৎসাহ নেই। আবার আধুনিক ভাবগীতি ও রবীন্দ্রসংগীত ভোট পেয়েছে শতকরা ৫০-এর বেশি লোকের কাছে। ভোট গণনায় যথাক্রমে দেখা যায়, চাহিদা বেশী আধুনিক গীতি, রবীন্দ্রসংগীত, যন্ত্র-সংগীত, নাটক, যুদ্ধের খবর, এবং ধর্ম সংগীতের। ওস্তাদী গানের সময়, গড়পড়তায় দেখা যায়, লোকে আরো কমাতে চায়। প্রসঙ্গত, মেয়েরা পুরুষের চেয়ে মহিলা অনুষ্ঠান, আধুনিক ও রবীন্দ্রসংগীত এবং নাটকের ভক্ত। আর তাঁরা খবর বক্তৃতা এসব বিশেষ পছন্দ করেন না। বয়স, শিক্ষা ও পেশা অনুসারে এই সব চাহিদার নানা রকম তারতম্য ঘটে। পঞ্চাশোর্ধ্বে যেমন ভক্তিমার্গে মন যায়, ম্যাট্রিক পাস করার পরে তেমনি যুদ্ধ সংবাদ ও মন্তব্য, বিদেশী সংবাদ, বিজ্ঞান, সাহিত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের দাবি বৃদ্ধি পায়। ঐ সব দফায় দেখি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর অনুরাগ নেই, তাঁদের উৎসাহ নাটকে ও ধর্ম সংগীতে। বৃত্তিজীবীরা তার বিপরীত। ছাত্রেরা প্রায় সব দফাতে ক্ষুধার্ত। এবং এই চাওয়ার ক্ষমতায় ভূসম্পত্তিবানেরা ছাত্রের পরেই। ওস্তাদী গানের একমাত্র ভক্ত কিন্তু ভূসম্পত্তিবানদেরই বলা যায়, ওস্তাদী ঐতিহ্যের অবশেষ ও সময়ের প্রাচুর্য তাঁদের হাতে আছে বলেই। গায়কের যে দায়িত্ব রূপায়ণে বা ইন্টরপ্রিটেশনে, সে দোভাষী দায়িত্বও বলা বাহুল্য ওস্তাদী গানে বেশি, যেমন বেশি রবীন্দ্রসংগীতে। রবীন্দ্রসংগীতের সৌকুমার্য

গায়কগায়িকা সমাজে সুলভ, কিন্তু কণ্ঠশক্তির সাধনা ও ব্যক্তিত্বের আবেগ রবীন্দ্র-সংগীতেরও রূপায়ণে একান্ত প্রয়োজন। অধিকন্তু, কবির ব্যক্তিস্বরূপের প্রবল পটভূমির বোধেই সার্থক তাঁর গানের সুকুমার ব্যঞ্জনা।

৮

আঠারো দফার মধ্যে পাঁচটি সবচেয়ে বেশি পছন্দসই দফা কি, এ প্রশ্নের গড়পড়তা উত্তরে প্রথম যান হল আধুনিক গীতি নামক দফার, শতকরা ৫০·৬। রবীন্দ্রসংগীত ৪২·৮, নাটক ৩৯·৪, যন্ত্রসংগীত ৩৯·২, ধর্মসংগীত ৩১·১, যুদ্ধের খবর ৩২·০ এবং বাকিগুলি পরীক্ষায় বিকল বললেই হয়।

একটা লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে শোনা এবং চাহিদার মধ্যে প্রভেদ। যুদ্ধ সংবাদ শোনেন অনেকে, কিন্তু শ্রবণেচ্ছু সংখ্যায় কম। সংগীত শিক্ষার দফাতেও তাই। এ দুটি ঠিক সময়হরণার্থে প্রমোদও নয়। ওদিকে, নানাবিধ সংগীত ও নাটকের বেলায় শোনার চেয়ে চাহিদা বেশি—হয়তো এগুলিকে আরো শ্রাব্য আর আরো সুবিধাকর সময়ে করা যেতে পারে ভেবে। রবীন্দ্রসংগীত চাহিদার প্রমাণে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে কিন্তু শোনার কপাল গুণে ষষ্ঠ। এর কারণ কি শিল্পী নির্বাচন আর রবীন্দ্রসংগীতের ভাগে অতি অল্প সময় বিতরণ? প্রশ্ন-পত্রগুলি ঘাঁটলে মনে হয় শিল্পীর ব্যক্তিত্ব শিল্প দফার মহিমা বা মহিমার অভাব অনেকে সময়ে নির্দিষ্ট করে। গ্রাম্যসংগীতে নিরুৎসাহ কলকাতাবাসিনীও তাই দেখি আব্বাস-উদ্দীনকে নম্বর দেন। কৃষ্ণচন্দ্র দে, রাধারাণী প্রভৃতি শিল্পীবিষয়েও পক্ষপাত দ্রষ্টব্য।

৯

রেডিও-র দাম ও মেক্ মিলিয়ে দেখলে হয়তো ভিন্ন ভিন্ন স্টেশনের বেতার স্পষ্টতার উত্তরটি বেতারযন্ত্রকর্তার কাজে লাগতে পারে। দশটি বিদেশী, দশটি ভারতীয় বেতার কেন্দ্র বিষয়ে চারটি জিজ্ঞাসা ছিল: ভালো শোনা যায় কি চলনসই শোনা যায়, অস্পষ্ট না একেবারে শোনা যায় না। কলকাতার শুমারে স্বভাবতই স্থানীয় কেন্দ্র প্রথম হয়েছিল—শতকরা ৯০। দিল্লী শতকরা ৪১। তারপরে একেবারে সমুদ্র পারে যেতে হয়, তৃতীয় স্থান বি-বি-সি-র। চতুর্থ

বোম্বাই। বিদেশী কর্দে লণ্ডনের পরে আসে বের্লিন, টোকিও, চুং কিং। ইণ্ডোচায়না শতকরা ১৬'২, ফ্রান্স ১৩'০, সোভিএত য়ুনিঅন ১২'৫, তুর্কীর শ্রোতা কলকাতায় শতকরা ৮'৪।

এরপরে আমার সংক্ষিপ্তসারে অক্ষ, মিত্র ও নিরপেক্ষ শক্তির যুদ্ধ সংবাদ ও মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় আসা যাক্। এ সন্ধানে অনেকেই জবাব দেওয়া সঙ্গত মনে করেন নি। তবু কলকাতায় শতকরা ৬০ আর জগদ্দলে শতকরা ৬৭ জনের মতামত পাওয়া যায়। প্রশ্ন ছিল তিনটি পক্ষের বিষয়ে মন্তব্য চেয়ে—ইনটরেস্টিং, বিশ্বাস্য এবং প্রপাগাণ্ডা হিসাবে সার্থক কি না।

মনে রাখবেন সময়টা ১৯৪১। কাজেই এ দেশে বেশী লোকের কাছে যে শত্রুর বেতার ঘোষণা মনোজ্ঞ বিশ্বাস্য, তাতে আশ্চর্য কি? অনেকের পক্ষে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আর্থিক প্রাদেশিক ও ভাগ ফলটা! রেওয়াজ যে বাংলাদেশেই জর্মান প্রীতি সমধিক ছিল নিম্ন এবং মধ্যবিত্তে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষার উপরতলায় বেশি আস্থা ছিল বটে নিরপেক্ষ বেতারবার্তায়, তবে মাসিক চারশো টাকার উপরে গেলে ফ্যাসিস্ট ক্ষমতা, সত্যবাদিতায় ভক্তি বেড়ে ওঠে। আবার বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে মিত্রপক্ষ বেতারে আস্থা বর্ধমান। যুক্তিযুক্ত ভাবে বৃত্তিভোগী বা পেশাজীবীরা নিরপেক্ষ সংবাদে নির্ভর করেন, তারপর মিত্রশক্তির আত্মপ্রচারে। যে ভাগ্যবান ব্যক্তিরা বিনাকর্মে কালাতিপাত করেন, তাঁরা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও বহুবিধ বাঁধা চাকুরিয়া নিছক মিত্রশক্তির অনুরাগী। মেয়েদের কৌতূহল কিন্তু নাৎসি আবেদনে। মুসলমান নমুনা সংখ্যায় সামান্য হলেও প্রতিনিধিমূলক বলা যায়। মুসলমান প্রতিক্রিয়া শত্রু বেতারের পক্ষেই গিয়েছিল। তেমনি অবাঙালীর সংখ্যা শুমারে কলকাতাতে কম হলেও মতামতের তারতম্য বিস্ময়কর। হিন্দি, উর্দু ও মারাঠি ভাষীরা দেখা যায় বাংলাভাষীর চেয়ে বেশি রকম অক্ষশক্তিকে বিচক্ষণ ভাবেন। প্রাদেশিক ভাগে এই সংক্ষিপ্ত টেবলটি পাঠকের কৌতূহল জাগাতে পারে:

	মনোজ্ঞ			বিশ্বাস্য			সার্থক প্রচার		
	শত্রু	মিত্র	নিরপেক্ষ	শত্রু	মিত্র	নিরঃ	শত্রু	মিত্র	নিরঃ
আসাম	১০০	০	০	১০০	০	০	৫০'	০	০
বাংলা	৫৪'৮	২৮'০	১৭'২	৫৪'৯	১৮'৯	২৬'২	৬১'	২৮'৫	১০'৫
বিহার	৯৩'৩	৬৭'০	০	৮৬'৭	১৩'৩	০	৯২'৯	৭'১	০
বোম্বাই	৬০'০	২০'০	২০'০	৫৪'৬	৩৩'৩	১১'১	৮৮'৯	১১'১	০

	মনোজ্ঞ			বিশ্বাস্য			সার্থক প্রচার		
	শত্রু	মিত্র	নিরপেক্ষ	শত্রু	মিত্র	নিরঃ	শত্রু	মিত্র	নিরঃ
মধ্যপ্রদেশ	৬৬·৭	৩৩·৩	০	১০০	০	০	১০·০	০	০
মাদ্রাজ	০	১০০	০	০	০	০	০	০	০
পাঞ্জাব	১০০	০	০	৬৬·৭	০	৩৩·৩	১০০	০	০
ত্রিবাঙ্কুর	৭৫·৯	০	২৫·০	৫০·০	৫০·০	০	৭৫·০	২৫·০	০
যুক্তপ্রদেশ	৭৬·২	১৪·৩	৯·৫	৬৩·৬	১৩·৬	২২·৭	৭৬·২	১৯·০	৪·৮

সাধারণভাবে বলা যায় যে বিশেষ শিক্ষাদীক্ষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া মোটামুটি বেশির ভাগ মতই অক্ষশক্তির বেতারবার্তার পক্ষে যাচ্ছে—বা ১৯৪১-এ যাচ্ছিল।

বহু কাজ এখনো করা যায় শুধু এই রেডিও শুমার নিয়েই। তাছাড়া জনরুচির সাধারণ শুমারে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান মিলবে। ইংরেজি লেখক সূচী, বাংলা লেখক সূচী, ইংরেজি ও বাংলা ফিল্ম্ সূচী মিলিয়ে বেশ সামাজিক মানস ও সংস্কৃতির ছক পাওয়া যায়। যিনি এড্গার ওআলেসের ভক্ত তিনি কি দীনেন্দ্রকুমার রায়েরই ভক্ত, না অনুরূপা দেবীরও বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়েরও? এমিল্ জোলা মারি আঁতোআনেৎ ও কিং কং কি করে একই সঙ্গে প্রিয় হয়? বা স্টীভন স্পেণ্ডর ও এড্গার ওআলেস? আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের কৌতূহলও জাগতে পারে যেমন—বুদ্ধদেব বসু ও সজনীকান্ত দাসের খ্যাতি এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও সমর সেনের আপেক্ষিক পাঠকের অভাব। তাছাড়া বিধবাবিবাহ, বিপত্নীকবিবাহ, স্বগোত্রবিবাহ ইত্যাদি বিবাহবিষয়ক বিস্তৃত আলোচনার বস্তু আছে। আরেক জিজ্ঞাস্য হচ্ছে বোম্বাই-এর কংগ্রেসের ঐক্য বিষয়ে এবং জাপানের ও আমেরিকান যুদ্ধ ঘোষণার সম্ভাবনার বিষয়। খেলাধুলার, রোজকার পাঠ্য খবরের কাগজের নাম, বিদ্যালয়ে ধর্ম-শিক্ষা বিষয়ে মতামত, চা-কফি ইত্যাদি নেশা, এলোপ্যাথাদি চিকিৎসাপদ্ধতির পক্ষপাত। সাধারণ শুমারের একটি ভাগ হচ্ছে কোষ্ঠী-বিচার ও কর-বিচার: বিশ্বাস আছে কিনা, নিজের বা অন্যের ক্ষেত্রে মিলেছে কিনা প্রভৃতি প্রশ্ন। এর সঙ্গে লেবরেটরি থেকে আরেকটি স্বতন্ত্র সন্ধান হয়েছিল, দুই মিলিয়ে অসহায় বাঙালীর অতিপ্রাকৃতে আস্থার উপরে মূল্যবান একটি বই লেখা যায়। ১৯৪১-এ নমুনানুসারে দেখা গিয়েছিল যে কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজে দুই-তৃতীয়াংশ লোকের ঠিকুজী আছে এবং এক-তৃতীয়াংশের আছে গণনায় বিশ্বাস। ১৯৪২-

এ এক শিশুসদনের ৩০০ শিশুর জন্ম ও অকালমৃত্যু গণনার সঙ্গে মেলানো হয়েছিল।

উপরের সামান্য আভাসেও বোঝা যাবে আমাদের জীবনের নানা সমস্যায় সংখ্যাবিজ্ঞানের সাহায্যের মূল্য কতখানি। বিংশ শতাব্দীর মানুষের সমস্যা অভূতপূর্বভাবে বিরাট ও জটিল, তার সমাধানও কঠিন ও সমষ্টি-সাধ্য! তবু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের (জে.ডি. বর্নাল) কথাতেই শেষ করি :

কোনো সমাধান যে হতে পারে সে শুধু বিজ্ঞানের বৃত্তি ও বিজ্ঞানের নানা পদ্ধতির বিকাশের জন্যই সম্ভব। বিশ্বব্যাপী মানুষের পুনর্গঠনের বীজ এরই মধ্যে সেখানে রোপিত। আমরা আজ প্রয়োজনীয় যা-কিছু দ্রব্য সবই তৈরি করতে পারি, বিতরণের ব্যবস্থাও আমাদের আয়ত্তে, বিতরণের জন্য দেশে দেশে যোগাযোগ নির্মাণ আজ সম্ভব। আর তার চেয়ে মূল্যবান হচ্ছে বিজ্ঞানের আহৃত সেই জ্ঞান, যাতে আমরা অনুসন্ধান করতে পারি, পরিমাণ করতে পারি একটা মানবসমাজের পরিবর্তনশীল নানা প্রয়োজনের মতো বিরাট ও জটিল তথ্য।

২

বাংলা সাহিত্যে প্রগতি

বাংলা সাহিত্যে প্রগতির কথা প্রায়ই শোনা যায়। এবারে মনে হয় কথাটা বিশেষ একটা অর্থেই পাচ্ছে। তার একটা কারণ অবশ্যই মনের আবহাওয়ায় কয়েক বছর যে প্রত্যক্ষের দিকে বৈজ্ঞানিকমন্য ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, সেই ঐতিহাসিক দৃষ্টির প্রসার। তাছাড়া লেখকেরা যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, তার থেকেও লেখার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বলা যেতে পারে যে আমাদের সাহিত্যের শৈশব অতিক্রান্ত এবং সাহিত্যিকরা আজ বিষয় ও কলাকৌশল, ভাব ও রূপের অভিন্নতায় সন্দেহহীন। কলাকৌশল বা টেকনিকের প্রগতি নির্ভর করে মানসের ব্যাপ্তি বা রূপান্তরে। আর এই মনের মানচিত্রে সৃষ্টির আবেগ থাকবে কি করে যদি সে জীবনের দিকে না তাকায়? সাধারণের জীবনেই তো এ মানসসরোবরের উৎস, যদিচ তার নীল জলে আকাশের ছবি প্রতিফলিত। এই উৎসের সন্ধান কেউ হয়তো জীবনযাত্রার কর্মধারায় পান, কেউ জনগণমন-অধিনায়কদের খুঁজে পান, ইতিহাসের দ্বন্দ্বময় প্রগতিতে।

সমস্যা ওঠে জ্ঞান ও সৃষ্টিক্রিয়ার হ্রস্বদীর্ঘে। কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে প্রত্যক্ষ জীবন থেকে মন সরে যায় জ্ঞাত পরোক্ষের স্বকীয় ধর্মে। শিল্প-সাহিত্যে কিঞ্চিৎ স্থায়ী বন্দোবস্তের কারণ মানবচৈতন্যেরই ভেস্‌টেড ইন্টারেস্টস্ বা সম্পত্তির স্থাবরতার দিকে ঝোঁক। ভাষার একটা স্বাভাবিক স্থিতিপ্রবণতার জন্য রচনার গতিতে আসে দ্বিধা। গতিতে গা ভাসালে অবশ্য খুঁটিতে বাঁধা মনের দ্বিধাও নিষ্প্রয়োজন। সজীব রচনাতে তাই শিল্পী ও শিল্পবস্তু, বিষয় ও টেকনিকে টান পড়ে জ্যাবদ্ধ ধনুকের টংকারে ধনু ও ছিলার টানের মতো। লক্ষ্যভেদের লক্ষ্য হয়তো অনেক সময়ে সরাসরি চেনা যায় না, ধনুর্ভঙ্গও হতে পারে। তবু প্রগতিশীল সাহিত্যের চিরকালীন লক্ষণ হল এই চৈতন্য-জ্যাবদ্ধ টান। অভ্যাসিক শিল্প উপাদেয় পণ্যশিল্প হতে পারে, চমৎকার কুটিরশিল্প হতে পারে. প্রগতির প্রশ্নক্ষেপ সে অভ্যাসের যন্ত্রে অবান্তর।

নেতিতেই আরম্ভ হতে পারে এই মানসের প্রগতি। তারপরে, মিনারবাসীর ভূতলে অবতরণ। মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে ঐ চৈতন্য, ঐ বোধ। ঐ বোধের পেশীবহুল ছাপ আসে স্বভাবজড় পাথরে, রংরেখায়, শব্দে ভাষার বনেদী রীতিতে বাক্যের গোঁড়ামিতে। জীবনের প্রত্যক্ষে আর সর্ব-সংস্কৃতিগত পরোক্ষের দ্বন্দ্ব থেকে-থেকে মাটিতে এসে মেশে প্রচণ্ড পালোয়ানিতে। তাই প্রয়োজন শিল্পীর অপক্ষপাত, পিকাসোর মতো নৈর্ব্যক্তিকতার সিদ্ধান্তে যাতে দ্বন্দ্বটা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। ব্যক্তিগত বিষয়ী মাহাত্ম্যের ভঙ্গীটা অভ্যাসে সহজ, কিন্তু সেখানে ধনুকের বন্ধন না থাকলেও, তীরের মুক্তিও নেই। অবশ্য একাকিত্বের শানে মাথা কুটেও মর্মান্তিক রোমাঞ্চকর গান রচনা করা যায়, বহির্জগতের পরিবর্তনকে মানসে না মেনে। অরণ্যে রোদনেরও সাময়িক সার্থকতা স্বীকার্য। আর নেতি নেতি ধ্বনিতে প্রত্যক্ষের অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়, হরিণ্যকশিপুর ঈশ্বরপ্রমাণের মতো।

টেকনিকের সাধনাই শিল্পীকে জিজ্ঞাসার সীমান্তে টেকনিকের উৎসে নিয়ে যেতে পারে। রচনার পদ্ধতি চৈতন্যমার্গ বা বিশ্বাসের বিরোধী, এ কথা শুধু অতিবামপন্থীদের অপ্রাকৃত মনেই ওঠে। কারণ বিজ্ঞানপদ্ধতির সত্যের মতো শিল্পপদ্ধতির উপার্জনও শ্রেণীহীন। মায়াকভস্কির প্রতীকচর্চার পরিণতিতে তাই গন্তব্য ছিল বিপ্লব। একমাত্র ন্যায়সংগত পরিণতি ছিল সেইখানে, নাহলে থাকে র‍্যাঁবো-র মরুভূমিতে মৃত্যু। লুই আরাগঁ-র অবচেতন-বাদের খেলা থেকে ইউ. আর. আর. এস-এর গানের পরিণতিতেও তাই দেখি। অতএব লেখককে লেখা ছাড়তে কেউ বলেছে না, বলেছে শুধু লেখকধর্মী প্রস্তুতির কথা। আপন সমস্যাকে শুধু নিজের মনের গহ্বরনিষ্ক্রান্ত স্বয়ম্ভূ জীব না ভেবে, সে যে ইতিহাসব্যাপী সমস্যারও অংশ এই উপলব্ধির নিয়ত চর্চা লেখকের প্রস্তুতির সহায়। এ চর্চায় বিষয়বস্তুর ও আধারের বিস্তার ঘটে, অধিকন্তু জীবনের ধারা বহুমিশ্রিত সমগ্রতা পায়। আর সমগ্রের বিকাশের অসীম সম্ভাবনায় শিল্পীর শিল্পী হিসাবে পরিণতি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। বিষয়বস্তুর সন্ধানে বা ব্যক্তিগত বিশেষত্বের মৃগতৃষ্ণিকায় ঘোরার লাভ আখেরে কমই। কারণ নিছক শিল্পগত বিবেচনাতেও এই সমাজভঙ্গের দিনে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে সুস্থ পরিণতি ও ভারসাম্য আনা কঠিন। কারণ সমাজের সঙ্গে তাল কাটলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বোধও কেটে যায়। আর ঐ স্বাধীনতার বোধ ছাড়া মনের বিকাশ সম্ভব নয়। স্বাধীনতা তাই শুধু সীমা ও পারস্পরিক সম্বন্ধ স্বীকারে। নিঃসঙ্গতার অ্যাবস্ট্রাকশন্-এ—পরোক্ষ নিদানে স্বাধীনতা কোথায়?

কাব্যের উৎস যতই রহস্যময় হোক, কাব্য কিছু গোপন তন্ত্রমন্ত্র নয়। কাব্য

সম্বোধন, সম্বোধনে শ্রোতার সম্বন্ধ গ্রাহ্য। সোহহম-বাদে সম্ভাষণ সম্বোধনের সুযোগ বেশি নয়। আমাদের লেখকেরা জানেন যে দৃষ্ট ও জ্ঞেয় দ্রষ্টার জ্ঞানে জারিয়ে যায় এবং তার পরিবর্তনে তাঁদের পরিণতির ক্রান্তি। ইণ্টারপ্রিটেশন তাই চেঞ্জ-এ সম্পূর্ণ। সেই জন্যই তাঁর যন্ত্রবৎ নতুন অভ্যাসের কলে পা দেন না, কোনো দর্শন থেকে টুকরো কুড়িয়ে জোড়া লাগাতেও চান না। বিশেষত মার্কসীয় দর্শনে এই চিরকালের জন্য একবারে অর্জিত অভ্যাসের যান্ত্রিকতা অচল। সে দর্শনের ভিত্তিই হচ্ছে চিরদ্বৈতাদ্বৈতের গতিশীল জীবন্ত পরিণতিতে, প্রথাসিদ্ধ দার্শনিকতার জড় অবসর মার্কসিস্‌মে নেই। সে পরগাছা চালাকির চেয়ে জিজ্ঞাসুমাত্র বিষয়ানুরাগ সার্থক।

বিষয়ের বা বস্তুসত্তার অনুরাগে অন্তত সেই নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি আসে যাতে শিল্পরূপ ও শিল্পবস্তু একটি সক্রিয়তার দুটি দিক বলে বুঝি। ইংরেজি সাহিত্যে এলিঅট্ প্রায়ই পেয়েছিলেন এই বিষয়-সমাধি। কিন্তু তার আশ্চর্য পরিণতি তির্যক হয়ে রইল বর্তমানে অবাস্তব এক ধর্মসমাজঘটিত দর্শনের হস্তক্ষেপে। তবু বলতে হবে যে এলিঅটের এই বিষয়শ্রদ্ধাই তাঁকে ইংরেজদের শ্রেষ্ঠ কবি করেছে এবং ঐ নৈর্ব্যক্তিক প্রয়াসের জন্যেই তাঁর প্রভাব হয়েছে মুক্তিবহ। কিন্তু রাজনৈতিক মতবাদের কুম্ভীরক বৃত্তিতে যে মুক্তি নেই, সেটা আবার স্মরণ করি। দার্শনিক চয়নিকা প্রয়োগে বামপন্থীর মনোবিকার যে ঘটে, তার প্রমাণ অডেন্-স্পেণ্ডর-লুইসের দল। তাছাড়া, একটা মতবাদের জ্ঞানের দিক যখন গভীর হয়—এবং আমরা কড্‌ওএল-এর 'ইলিউসন অ্যাণ্ড রিয়ালিটি' বা জ্যাক্ লিণ্ডসের 'শর্ট হিসট্রি অব কালচার' ও 'দি অ্যানাটমি অব স্পিরিট'-এর কাছে একান্ত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি—তখনও শিল্পসাহিত্যের উৎসে চৈতন্যের গভীরে সে মত চারিয়ে যেতে সময় লাগে। কড্‌ওএল-এর বা লিণ্ডসের কবিতায় প্রাক্‌মার্কসীয় মামুলিত্ব কথাটার প্রমাণ। তবু তো কড্‌ওএল জীবন দিয়েছিলেন এই মতে নিজেকে মেলাবার জন্য। আর যাঁরা এই জীবনে বুদ্ধিতে এক সাধনা ধরেন নি, যাঁরা এক দাগ ওষুধের মতো পাঁজির বর্ষফলের মতো মার্কসিস্‌মের চটক ব্যবহার করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের নিজেদের মনগড়া ছক থেকে দূরে যাবার প্রতিবিপ্লবী ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। এলিঅটের নৈর্ব্যক্তিকতার তীব্র চেষ্টা এর চেয়ে প্রগতিবান। তাঁর ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, বিষয়বস্তুর নির্বাচনে ব্যক্তিগত বিশৃঙ্খলা বিষয়ের নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষে দানা বাঁধতে পারে। সে কৈলাস-ভাবনা থেকে তবু ঐতিহাসিক দৃষ্টির বিস্তার আনা সম্ভব, দৃশ্যটা অন্তত আয়ত্তে আসতে পারে। চালাকির

দ্বারা কোনো মহৎকার্য সাধিত হয় না, এই কথার জের টেনেই বলা যায় যে খণ্ডিত মনের হঠকারিতায় প্রতিক্রিয়ার চোরাবালিই পরিণাম, ব্যক্তিস্বরূপের মুক্তি নয়। ভালেরির আত্মভুক্ সর্পে নয়, আমাদের লেখকেরা জানেন যে বিশ্বরূপ-দর্শনেই ব্যক্তির ঐশ্বর্য।

ব্যাপারটা বলাই বাহুল্য, মোটেই সরল নয়। তার উপরে আছে বাংলা সাহিত্যের অপরিসর কিন্তু বিশিষ্ট ঐতিহ্যের চাপ। এবং সংস্কৃতিগত রচনায় প্রত্যক্ষ ইমারতকে অস্বীকার করে অর্থনীতিগত কাঠামোতে কাজ করা যায় না। আমাদের লেখকেরা চেষ্টা অবশ্য করছেন (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ স্থানমাহাত্ম্য—লোকাল কালার এ কথাটার প্রমাণ,) প্রত্যক্ষ জীবনযাত্রা ও মানস-কে সেতুবন্ধে মেলাতে, কিন্তু চৈতন্যের স্রোত গভীর ও প্রবল। সেই গভীরেই শিল্পসাহিত্যের কারবার। হয়তো যদি কিছু প্রচণ্ড আলোড়নে সারা দেশের জনমানস পাশ ফেরে, তাহলে এই দ্বিধা দ্রুত সমাধান পেতে পারে। ইতিহাসের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে আর তাতে জনসাধারণের আত্মসচেতনতা বৃদ্ধিতে কল্পনারাজ্যেও লাগছে হাওয়া। তাই জনসাধারণের জীবনে ও আন্দোলনে লেখকদের দৃষ্টি যেমন বেশি যাচ্ছে, তেমনি বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যে ও টেকনিকের প্রশ্নেও লেখকেরা মন দিচ্ছেন।

এই সাহিত্যিক ঐতিহ্য মোটামুটিভাবে স্যাক্সনোত্তর ইংরেজি সাহিত্যের সমবয়সী হলেও এর ক্ষীণধারা শুধু থেকে থেকে কয়েকবার ঝল্‌সিয়ে উঠেছে। সংস্কৃত ঐতিহ্যের অতি নিকট হলেও বাংলার প্রকৃত ঐতিহ্যের স্বভাব ভিন্ন। এমনকি কৃষ্ণকীর্তন-এর মতো প্রাচীন ও কাঁচা রচনাতেও আমরা সংস্কৃতের রাজসভাশোভন প্রথাসিদ্ধ মানস ও দেশজ লৌকিক মানসের অস্পষ্ট কিন্তু সুস্থ প্রাকৃতধর্মের বিরোধ দেখতে পাই। লোকমানসের এই স্বাতন্ত্র্য শুধু গ্রাম্যতা বা স্থূলতা ভাবলে ভুল হবে। এ মানস জীবনধর্মী, জীবনভোগী, প্রত্যক্ষবোদ্ধা মন, যা জনসভ্যতারই প্রাণময় লক্ষণ। এ এক জীবনকে পরিগ্রহণের ভঙ্গী, প্রাত্যহিককে স্বীকারের দর্পণ, তাই এতে পাই হাসিকান্নার মধ্যে একটা বাস্তববিলাসের কর্মঠতা, সময়ে সময়ে অপরাজেয় জীবনশক্তির হাস্যোজ্জ্বল আভাস। এতে বিরুদ্ধে মেলে মানিয়ে নেবার স্বাস্থ্যে, দেবদেবী হয়ে ওঠে ঘরোয়া মানুষ, মানুষ হয়ে ওঠে বিস্ময়কর। এ মানসে অশ্লীতার সন্ধান অন্ধরুচির খেয়াল, কারণ এর মূল্যজ্ঞান এসেছিল সমাজের একটা বিশেষ সাময়িক

অখণ্ডতায়, শ্রেণীগত ধর্মব্যবস্থার মধ্যেই এক জীবনব্যাপী আবেগের ছকে। সে ছকের পৌরাণিক মহলে মহলে ছিল লোকের যাতায়াত, উপরে-নিচে ছিল সম্বন্ধ, নিচের লোক গোপন প্রতিশোধে টেনে আনত উপরের জবরদস্তদের। অনার্য শিব তো এইভাবেই গ্রীকপুরাণে ডায়োনিসের মতোই আর্যজগতে প্রবেশ করেন। আবার সেই নব্যআর্য শিব যখন ব্রহ্মণ্যবিলাসী হয়ে উঠলেন, তখন সে রুদ্র মহাদেবকে টেনে আনতে হল নেশাখোর বেকার স্বামীর প্রাপ্য গঞ্জনার মধ্যে। ব্রহ্মণ্যের অন্নদাতা সদাগরকে তাই মানতে হল মনসার লৌকিক শক্তি। অবশ্যই সংস্কৃতের বৈদগ্ধ্য অনেকখানি আমরা নিলুম, যেমন নিলুম অলংকার আর রীতির নির্বিশেষে অভ্যাসের সামান্যতা। উপনিষদ্ ও মহাভারতোত্তর সংস্কৃত সাহিত্যের ছদ্মধ্রুপদী ভাব যে তবু বাংলা সাহিত্যের গতিরুদ্ধ করতে পারে নি, সে শুধু দেশী কবিরা মৃত্তিকার সন্তান ছিলেন বলেই। জনমনের বিশ্বাস ও দৃষ্টি এবং তাদের জীবনের রূপের প্রভাবেই কন্ভেনশন্সের ঈষৎ ভিন্ন চেহারা আমাদের প্রতিবাদী প্রাকৃত সাহিত্যে।

বলার দরকার নেই যে সেকালে আমাদের স্বাধীনতার মাত্রা ইচ্ছাধীন ছিল না, না ছিল আত্মসচেতনতার সুযোগ বা প্রয়োজন। দুটি মোটা পথ ছিল— এক দেবদেবী ভাঙাগড়া, আরেক নরনারীর সম্বন্ধের বিদগ্ধচর্চা। সে চর্চার সফিস্টিকেশন আজও আমরা গ্রাম্যসাধারণেরও প্রেমালাপে শুনতে পাই।

মধ্যযুগের পরিধিতেই এই একটা মানবিকতার পথে লোকে নিষ্পত্তি ও ক্ষতিপূরণ আদায় করে এসেছে। চণ্ডীকাব্যে, নানা মঙ্গলকাব্যে, শিবদুর্গায়, পাচালী ও যাত্রা প্রভৃতি জননাট্যে এ ক্ষতিপূরণটা বেশ বোঝা যায়। চিত্রশিল্পেও এই মন কাজ করেছিল, পটে, পাটায়, মেলার পুতুলে, আল্পনায়, ব্রতকথায়, ছড়ায়, গ্রাম্যগানে এ মন রূপ পেয়েছিল (অবনীন্দ্রনাথের বাংলার ব্রত এদিকে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে।) পূর্ববঙ্গগাথায় এই জীবনেরই প্রত্যক্ষতা। লোকমনের দিগ্বিজয় প্রাদেশিক বাংলাদেশে মহাকাব্য দুটিতেও পৌঁছেছিল, বৈষ্ণব তত্ত্বকথাতেও তাই প্রেমের সরস আবেদন। মানি পদকল্প-তরু-র কন্ভেন্শনস্ প্রাণহীন—কেননা বৈষ্ণব কবিদের মন ছিল জনবোধ্য বিষয়ের আবেদনে, সংস্কৃত রীতিবাদীদের মতো কন্ভেন্শন্সের চর্চায় নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষণে ক্ষণে সূক্ষ্ম বাস্তবিকতার তীব্রতায় আমাদের মধ্যবিত্ত অভ্যাসের মধ্যে চমক লাগে। হঠাৎ এমন লাইন আসে যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যেই মেলে, যা আমাদের ডুবিয়ে দেয় মানুষের অভিজ্ঞতার গভীর সমুদ্রে।

অন্তর্দৃষ্টি ও আবেগের পরিধি বেড়ে যায়। প্রেমের বেদনা যে দুই চলিষ্ণু ব্যক্তির চলিষ্ণু সম্বন্ধের দোটানার যন্ত্রণা ও আনন্দ বৈষ্ণবকবি এটা আমাদের বিস্ময়করভাবে জানিয়ে দেন। খানিকটা অস্পষ্ট অবশ্য এই মানস। তবু এই মানসের ছাপ আমাদের য়ুরোপীয় যুগ অবধি মোটামুটি একভাবে দেখা যায়।

তারপরে এল তাতে পরিবর্তনের ঝড়। ঈশ্বর গুপ্তকে বলা যায় শেষ জনকবি, তিনি লিখেছিলেন ইতিহাসের ঘোর বিশৃঙ্খলার যুগে, অনির্দিষ্ট জীবনযাত্রার মধ্যে অতীতের ব্যবস্থার দিকে বারে বারে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে। এক হিসাবে বিদ্যাসাগর আমাদের সবচেয়ে শুদ্ধ ও মহৎ য়ুরোপীয়, তাই তাঁর দরদী মানবিকতায় দেশী সংস্কৃতি দানা বেঁধেছিল। বিদ্যাসাগর নিজের সমগ্রতার জগৎ থেকে খুঁজলেন সাধারণ ভারসাম্য, এক নতুন ও রীতিমতো সংস্কৃতঘেঁষা ভাষায়। তার কারণ বোধহয় প্রথমত সংস্কৃতের দীর্ঘ ইতিহাস এবং দ্বিতীয়ত তখনকার উচ্ছৃঙ্খল নিকট প্রাদেশিকতা থেকে সংস্কৃত ঐতিহ্যের দূরত্বের আকর্ষণ। মধুসূদনের বিলম্বিত এবং বিষয়হীন রোমাণ্টিক ভাবাবেগই তাঁকে আবার বাংলায় ফিরিয়ে আনল। তাঁর প্রচণ্ড প্রতিভায় দীপ্ত ভাষা অবশ্য বাংলার লৌকিক ঐতিহ্যে তাঁর য়ুরোপার্জিত দান। কিন্তু মধুসূদনের বিদ্রোহী রাগে দেবদেবীরা সাবেক বাংলার নরকল্পতাই পেয়েছেন, তাঁদের পোশাকী জাঁকজমক সত্ত্বেও। য়ুরোপীয় ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ মধুসূদনের মানসে বাংলার জনজীবনের দৃষ্টির আভাস আশ্চর্য ব্যাপার। নূতন সভ্যতাকে সে দৃষ্টি নিজের ভাষ্য দেয়, সমালোচনার বাস্তবে মিলিয়ে নেয়। তাই মধুসূদনের নাটক দুটিতে ভাষার যে সরস স্বাস্থ্য, যে দেশজ পেশীর সচ্ছলতা পুলকিত করে, তা আমরা বঙ্কিমের হিন্দুত্বের সঙ্গে ইংরেজশাসনের মিশ্রণকৃতিত্বে পাই না।

বরং পাই কয়েকজন দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকে, কালী সিংহে, টেকচাঁদে, এমনকি হেমচন্দ্রের কিছু কিছু সাময়িক পদ্যরচনায়। এঁদের দেখে কল্পনা করা যায় সে সময়কার দুই জগতের মধ্যে একটা সাময়িক ভারসাম্য। তাই দীনবন্ধু মিত্রকে প্রথম শ্রেণীর লেখক বলেই সম্ভাষণ করতে হয়, বিশেষ করে সধবার একাদশী-র সুস্থ বাস্তবিকতা ও ব্যঙ্গের জন্য। তাঁর পলায়ন-বিমুখ দুর্মর সাধারণ কারণ ও কার্য, উৎস ও গতিকে এক করতে গিয়ে দিশাহারা হয়ে অতীতে ছোটে নি। তাঁর মানবিকতার করুণা ও হাস্যজাগ্রত শুভবুদ্ধিতে তিনি আমাদের নাট্য-সাহিত্যের শীর্ষে।

তবে স্থিতিটা যে অসম্পূর্ণ ও নেহাত সাময়িক ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

না হলে আমাদের উপন্যাসের পুরোধা বঙ্কিম কেন তাঁর গম্ভীর আত্মমর্যাদা সত্ত্বেও উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিলেন। অবশ্যই ইওরোপীয় সভ্যতা, ব্রাহ্মণ্য ও মধ্যবিত্ত স্থূলতার প্রেস্‌ক্রিপশন কেবল তাঁর স্বকীয় দায়িত্ব ছিল না। বঙ্কিম তাঁর প্রতিভার দ্বারা দ্বন্দ্ব নিরাকরণের চেষ্টাই করেছিলেন, আজকে সাহিত্যে ও রাজনীতিতে প্রতিক্রিয়াবাদীরা যদি তাঁকে নিয়ে টানাটানি করে, সে দেশের দুর্ভাগ্য।

বাংলার ছোট ঐতিহ্যের ধারায় রবীন্দ্রনাথের বিরাট আবির্ভাব একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। এ প্রচণ্ড আবিষ্কারে আমরা যদি গালিলেও-র মতো উত্তেজিত হই তো সে মার্জনীয়। আমার এই সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবে তাঁর মতো প্রতিভার পরিচয় দেওয়া অসাধ্য। অথচ তাঁর তুলনা অন্য সাহিত্যেও ঠিক পাওয়া যায় না। একদিকে ইংরেজিতে চসর অন্যদিকে জর্মানে গয়টে মিলিয়ে হয়তো খানিকটা ঐতিহাসিক তুল্যাভাস দিতে পারেন। তাঁর প্রভাবে বাংলা সংস্কৃতির সুরে এল অনেক বিন্যাস, তাঁর প্রতিটি বই টেকনিকের প্রগতিতে পদক্ষেপ ও বিষয়বস্তুর বাহুবিস্তার। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথ আমাদের শেখালেন শালীনতা। মার্জিতরুচির এ উত্তরাধিকার অস্বীকার করা কোনো গোঁড়ামিতেই আর সম্ভব নয়। প্রাদেশিকতা-দুষ্ট বাংলায় তিনি আনলেন বিশ্বের মানদণ্ড। রোমান্টিকের পরিবর্তন-অভীপ্সা, হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম সৌকুমার্য, সংবেদ্যতা তাঁরই দান। বড় কথা, সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রথম পরীক্ষাতেই প্রয়োজন যে নিছক সৌন্দর্যের চেতনা. সেও আমরা রবীন্দ্রনাথেই দেখেছি। ভিক্টোরীয় চরিত্রের বলিষ্ঠ সততা, কর্মের দায়িত্ববোধও বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের রচনা।

ব্যক্তির যে স্বকীয়তাবোধ, সেন্স অফ প্রাইভেসি তাও রবীন্দ্রোত্তর সমাজেই বাংলার মানসে কিছু দেখা যায়। তাছাড়া শুধু শ্রেষ্ঠ নন, তিনিই আমাদের সাহিত্যিক পেশার দায়িত্বের প্রথম ও চরম উদাহরণ। তাঁর দান আমাদের নানামুখ আত্মসচেতনতায় মানুষ করে তুলবে, যদিও তাঁর সম্পূর্ণতা তাঁর একান্ত স্বকীয় ব্যক্তিস্বরূপেই সম্ভব। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যই তাঁর ব্যাপক কর্মক্ষেত্র ছিল, তবু তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ নদীর মুখর স্রোত নয়, সংহতসত্তা হিমালয় নামে নগাধিরাজ যেন। যান্ত্রিক বামপন্থী ব্যাখ্যায় এই মহত্ত্বের মর্যাদা হয় না। বনেদী পরিবার, সামন্ততন্ত্রসমাজের অবশেষ ও বুর্জোয়া সভ্যতার উত্থানশক্তির সন্ধিক্ষণে তাঁর আবির্ভাব এসব কথায় তাঁর দুর্নিবার প্রতিভার নিঃসঙ্গ সৃষ্টির আবেগের আংশিক ব্যাখ্যামাত্র। মহর্ষির প্রভাব, ব্রাহ্মসমাজের মানসও নিশ্চয়ই তাঁর প্রবল

বিশ্বাসের মূলে ছিল, যার বলে সুন্দর ও মঙ্গল তাঁর কাছে পরোক্ষতত্ত্ব মাত্র ছিল না, ছিল জীবনের উদারনীতিক সত্য। তবু তার প্রাণময় রহস্য শেষ হয়ে যায় না।

তবু শূন্য শূন্য নয়
ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন।
একা একা সে অগ্নিতে
দীপ্তগীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।

আশ্চর্য এই তৃপ্তিহীন প্রাণময়তার আশীবছরব্যাপী সমগ্রতা। এতেই টেকনিকের নব নব বিকাশে বিষয়ের প্রসার, এতেই শেষটা তিনি তাঁর পটভূমি প্রায় পিছনে ফেলে আধুনিক জীবনের মহত্তম কবি হয়ে উঠেছিলেন। তবু মোটামুটি বলতে হবে যে তাঁর নক্ষত্রবিহারী প্রতিভা বাংলার রসালো মাটিতে মানুষ আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তবতায় বিরাজমান থেকেও বহু ঊর্ধ্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেখানে মধুসূদন বা দীনবন্ধু বরং আমাদের চেনা অগ্রজ।

সুখের কথা যে আমাদের লেখকেরা ইতিহাসের এক বড় মোড়ে দাঁড়িয়ে সাহিত্যের স্বরূপ উপলব্ধিতে চিন্তিত। সে স্বরূপ সন্ধানের ইয়েটসের সেই 'গ্রেট মাদার'-র প্রভাব আজ স্পষ্ট—সেই বিশ্বজননী; মৃত্তিকার মানুষের মনের দীর্ঘ স্মৃতি; ফ্রয়েডের অবচেতন; যিনি বিরহী দ্বন্দ্বে ক্ষেপিয়ে বেড়ান, জনসমষ্টির মিলনে যদি একবার তাল কাটে। তাই তো আজ মানব-চৈতন্যের বিকাশের বর্তমান অবস্থায় আমরা বুঝেছি যে টেকনিক ও জীবনোৎসারিত বিষয়বস্তু একটি ক্রিয়ার দুটি দিক, আর লেখক শুধু মাত্র কারুশিল্পী নয়, শুধু অনুপ্রেরণায় মত্তও নয়, সমগ্র মানুষ, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় ভাবেই। অধিকন্তু শিল্পেতিহাসে প্রাথমিক গোষ্ঠীজীবনের কাল থেকে আমরা দেখেছি যে বস্তুরূপ ও বস্তুসত্তা অঙ্গাঙ্গী ধারায় চলে। রূপজ্ঞানের চর্চায় বহু শতাব্দীর সঞ্চয়ের পরে আজ তাই দেখি নিছক রূপায়ণে আসে প্রতীকের দ্রুতবোধ্যতা—যদি অবশ্য সমাজে থাকে সম। সুতরাং সজীব সমাজে উঁচ্ কপালে রূপচর্চা ও কন্‌ভেন্‌শন্‌সের সাক্ষাৎ আবেদন, সেকালের সাহিত্যিকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বস্তুচর্চার বুর্জোয়া ঐশ্বর্যের অনুকরণে নয়। সাম্যবাদের প্রাকৃতধর্মে নিশ্চয়ই পণ্যবিপ্লবের প্রথম যুগে ফিরে চলার আহ্বান নেই।

৩

বাংলায় শিল্পচর্চা

১. অবনীন্দ্রনাথ

এক হিসাবে চিত্রশিল্পের সংবেদন মার্গে যে শুদ্ধির অবকাশ, তাতেই সাধারণ মানুষের আবেগ সহজে জাগে এবং সে আবেগের কথা বলতে গিয়ে তাকে প্রথাসিদ্ধ শিল্পসমালোচক সাজতে হয় না। বাঙালী শিল্পীর রচনা এক হিসাবে এ দেশের নবজাগরণে, যাকে বলে জাতীয় রেনেসান্স-এ সক্রিয়তার একটি দিক। যে সাধারণ্যে রুচি মূর্তি নিচ্ছে, সেই জনরুচির মানেই তাই এক্ষেত্রে কান্তিবিদ্যার মানদণ্ড প্রয়োগ সম্ভব। ভাষাবহ শিল্পেও অবশ্য ছন্দের প্রাথমিক অঙ্গীকার আছে, এবং ছন্দ মূলত শুদ্ধ সন্দেহ নেই, নৃত্যের শারীরিকতা ও সামাজিকতাতেই ছন্দের বংশনির্দেশ। কিন্তু বংশপরিচয়ে পুরুসার্থ সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রাথমিক ছন্দের প্রত্যক্ষ আবেগ আমরা দীর্ঘকাল হল হারিয়েছি· সভ্যতার প্রগতির অনিবার্য কারণে, যেমন শ্রুতির মিথ্ বদলেছে স্মৃতির পুরাণে, প্রতীক বদলেছে ব্যক্তিগত কল্পপ্রতিমায়। ভাষার বহুধাব্যবহার ও সামাজিক ক্রমচ্ছেদের গতি সভ্যতার সঙ্গে সমানতালেই চলেছে। কিন্তু একদিকে সংগীত আর অন্যদিকে দৃশ্যশিল্পে এখনও বিভিন্ন আবেদনের পরিচ্ছন্নতা খানিকটা বর্তমান। রং এখনও কৃষি বা যন্ত্র বা মসীজীবীর জীবনবোধের বৃদ্ধি সাধন করে, রূপাকার এখনও আমাদের স্পর্শাবেগে সম্পূর্ণতা আনে, শেষ পর্যন্ত আমাদের পেশলতন্ত্রের তারে মোচড় দেয়।

এই আবেগে ধরা দেয় বস্তুর অধরা সত্তা, শিল্পীর চৈতন্যে এবং শিল্পের মাধ্যমে চারিয়ে রূপান্তরে। শিল্পীমানসের অন্তর্গতিতে, তাঁর প্রকাশের তাগিদের বিচারেই তাঁর বাস্তব উপলব্ধির সততার বিচার। আমাদের শিল্পরেনেসান্সের ইতিহাস এ বিচার ছাড়া বোধ্য নয়। এ বিচারেই অবনীন্দ্রনাথের সূত্রপাত ঐতিহাসিক সার্থকতা পায়, এ বিচারেই সেই ধারা পরিণতি পায় যামিনী রায়ের পাকা তুলিতে এবং তারই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা দেখতে পাই তরুণ শিল্পীদের

কাজে, গোপাল ঘোষ, নীরদ মজুমদার, রথীন্দ্র মৈত্র, প্রাণকৃষ্ণ পাল, চিত্তপ্রসাদ, তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের শিল্পচেষ্টায়।

প্রথমেই নমস্য তাই অবনীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর গভীর শিল্পস্বভাবে আর সেই শুদ্ধ কারণে বাংলার লৌকিকজীবনের সঙ্গে দুর্মর সাযুজ্যে বুঝেছিলেন কোথায় বাংলার নবজাগরণের উৎস। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব, সমাজ সংস্কার, ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন ইত্যাদি যে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সত্য নয়, সে বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথই প্রথমে আমাদের সচেতন করেন, পালটা গোঁড়ামির বাঁধি গতে নয়, সৃষ্টিময় শিল্পচৈতন্যেরই সার্থক এষণায়।

এ কাজে তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী হ্যাভেলের ভাষায় পথনির্দেশ এই :

'Present methods of education have opened a rift between the artistic castes and the "educated" such as never existed in any previous time in Indian history The remedy lies, not in making Indian artists more literate in the European sense…nor in manufacturing regulation pattern books but in making the literate, educators and educated conscious of the deficiencies of their own education…'

সম্প্রতি ইংরেজ সমালোচক এলিক ওয়েস্ট এক প্রবন্ধে (মডার্ন কোয়ার্টর্লি —মার্কসিস্‌ম ও কালচার) ভারতবর্ষে এখনো অবশিষ্ট এই লোকশিল্পের স্থান আলোচনায় প্রায় এই প্রশ্নই তুলেছেন. তিনিও মনে করেন যে আমাদের শিল্পভবিষ্যৎ খানিকটা স্বচ্ছ, কারণ ঐ তথাকথিত ইওরোপীয় শিক্ষার যে অ্যাকাডেমিক বা মাছিমারা বস্তুতান্ত্রিকতার বন্ধন সেটা এখনও আমাদের জনসাধারণের রুচি একেবারে নষ্ট করে নি। কথাটা পুরানো বা নতুন কোনো রেগুলেশন কপিবুক তৈরি ও চালু করার আগে সবার পক্ষে, মার্কসিস্টেরও পক্ষে স্মর্তব্য। বলাই বাহুল্য, ভবিষ্যৎ রচনার সহজ ব্যাপার নয়। কারণ ঐ হ্যাভেলোক্ত 'শিক্ষিত' ও ইংরেজিহীন শিল্পকর্তা জনসাধারণের মধ্যে ভেদটা নগণ্য নয়, এমনকি চিত্র বা গঠনমূলক শিল্পাদিতেও, যদিও ভেদটা সাহিত্যেই বেশি প্রকট ভাষাগত কারণে। ভেদের জোড় লাগবে অবশ্যই বৃহত্তর সমাধানে, নিছক শিল্পক্ষেত্রেই যে চেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকবে না। হ্যাভেল তাঁর ভারতীয় সংস্কৃতির অগাধ জ্ঞান ও শ্রদ্ধা নিয়েও একথা ঠিক বোঝেন নি, যদিও মার্কসের ভারতীয়

পত্রাবলীতে এর নিশানা মেলে। হ্যাভেল তাই সামাজিক জীবনের সমগ্রতার ঘোড়ার মুখে জুততে চান শিক্ষার আংশিক সমাধানের গরুর গাড়ি।

কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যের দান কতখানি হতে পারে আমাদের জাতীয় জীবনের নবজাগরণে সে বিষয়ে হ্যাভেল প্রায় এলিক ওয়েস্টের মতোই দৃষ্টিবান—

'...behind all this intellectual and administrative chaos there remains in India a native living tradition of art, deeprooted in the ancient culture of Hinduism, richer and more full of strength than all the eclectic learning of the modern academies and artguilds of Europe...'

এর থেকে যদি ঐতিহ্যধারায় মানুষ অনাত্মচেতন কারুশিল্পী, অভ্যাসিক যাঁর কর্মপদ্ধতি এবং যাঁর স্থিতীয় মন বিশেষ কিছু স্বীয় কর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না তাঁর সঙ্গে, যে শিল্পীর কাজ মোটামুটি তাঁর মানসের সমগ্রতায় সচেতন কর্ম, সে শিল্পীকে এক করে ফেলি তাহলে আজ সেটা মারাত্মক ভুল, প্রতিক্রিয়াশীলতা বা অতীতসর্বস্বতারই নামান্তর। তার অর্থ এ নয় যে আমাদের লোকশিল্প যে বছরে বছরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা শিল্পীরা ভিক্ষায় বা অকাজে নামছেন, সে বিষয়ে কিছু কর্তব্য নেই। কিন্তু অতীতকে জীয়ানো যায় না, ইতিহাসকে এড়িয়ে কিছু শৌখিন বাড়ি সাজানোর জিনিস হয়তো পাওয়া যায়, আর্টিস্ট পাওয়া যায় না। ঐতিহ্যগত লোকশিল্পে শিল্পীর কোনো বিকাশ বা বিবর্তন নেই।

আসলে হ্যাভেলও কার্যত তা জানতেন, নাহলে তিনি কি করে অবনীন্দ্রনাথের সাহায্যে শিল্পশিক্ষার সরকারী স্কুল চালালেন শিল্পীর সম্ভাবনা ভেবেই, প্রথাসিদ্ধ তথাকথিত ভারতীয় কারুশিল্পী তৈরি করতে নয়।

শিল্প ও কারুকারের ঐক্যসাধনের প্রশ্ন এখানে উঠছে না, যদিচ উভয়ের সুস্থ সম্বন্ধপাত এবং একই ব্যক্তির মধ্যে শিল্পী ও কারুকারের ঐক্য একান্ত প্রয়োজনীয়। আধুনিক শিল্পের কিছুটা নীরক্ততা, কিছুটা টেকনিকগত দুর্বলতা নিশ্চয়ই এই ঐক্যের অভাবে। কিন্তু শিল্পীর পক্ষে আজ সজ্ঞান নির্বাচন অনিবার্য। আমাদের এই প্রাচীন চিরাচরিত মহাদেশেও জীবনের রূপ বদলেছে এবং এই প্রতিযোগিতার যুগে পণ্যের যুগে মানুষ তার মানসকর্মে বৃত্তিনির্ভর ধারাবাহিক স্বাক্ষরহীনতা হারিয়েছে, যেমন শক্তি লাভ করেছে ব্যক্তি স্বরূপের সাধারণ ঐশ্বর্যে, আত্মচেতনায়, প্রত্যক্ষ নির্বাচনের নির্বিশেষ ক্ষমতায়—সর্বদা না হলেও অন্তত

নির্বাচনের সম্ভাবনায়। অবনীন্দ্রনাথ সে নির্বাচন করেছিলেন, তিনি ইওরোপীয় যথার্থ্যমার্গে ওস্তাদ হতে পারতেন, বড় প্রতিচিত্রকর হতে পারতেন, মহত্তর রবিবর্মা হতে তো পারতেনই। কিন্তু তিনি স্পষ্টই হলেন ভারতীয় শিল্পের রেনেসান্সের নেতা।

এটা প্রাদেশিকতা নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির জগতে প্রায় অপাংক্তেয় বাংলায় যে কেন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কারবার পাতল, তার কারণ অবশ্যই কোনো জাতি-তত্ত্বে খোঁজবার দরকার নেই। সূত্রপাতে এবং সাংস্কৃতিক পক্ষপাতে অনার্য, ব্রহ্মণ্যের সবচেয়ে দুর্বল ঘাঁটি, দিল্লী থেকে বারাণসী কাঞ্চী থেকে দূরে বাংলার কিন্তু ছিল স্বকীয় সমস্যা ও সমাধান চেষ্টা—জীবনেরই মতো, লৌকিক শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। এবং বাংলাতেই গজাল ও বিকাশ পেল প্রথম ভারতীয় মধ্যবিত্ত, চাকুরিয়া, নব্যশিক্ষিত, সংস্কারক, প্রতিসংস্কারক, ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব থেকে জাতীয় ভারতের স্বপ্নের রাত অবধি।

অবনীন্দ্রনাথের সত্তার শিকড় এই বাংলার আদিম গভীরে। অবশ্যই তিনি নবাবী আমেজ পেয়েছিলেন, বৃটিশপূর্ব ও প্রাক্-বৃটিশ দরবারী সংস্কৃতি তাঁরও স্মৃতিতে সঞ্চারিত এবং মুঘল তস্‌বিরের বিলাসী সৌকুমার্য, রাজপুত চিত্রের গীতায়িত আবেগ, জাপানী ছবির সূক্ষ্ম পেলবতা ও ওয়াশ টেকনিক তাই তাঁর আয়ত্তে এল এত সহজে।

কিন্তু এও বাহ্য। প্রথম উৎসাহে এবং খানিকটা তখনকার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের দরুন তাঁর হ্যাভেল কুমারস্বামী প্রভৃতি বন্ধু ও ভক্তরা এবং ছাত্রেরা অবনীন্দ্রনাথের স্বভাব ও কাজের আরেক দিক, স্থায়িতর দিকটা গৌণ ভাবেন। তাঁর প্রতিভার সেদিক দেখি তাঁর বাংলার নিসর্গ দৃশ্যমালায়, চণ্ডী ও কৃষ্ণলীলার চিত্রে, ঠাকুমা, শিশু ইত্যাদি ঘরোয়া ছবিতে। তাঁর প্রতিভার এই দিক থেকেই তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠতম লেখকও বটে। তাঁর গল্পের বইতে তাঁর মজাদার নাটকে, ছড়ায় অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে গ্রামীণ বাংলার সংস্কৃতি নবস্বরূপ খুঁজে পায়। আমাদের ছড়া, গান, কথকতা, রূপকথা, মেয়েলি ব্রতে বাংলার প্রত্যক্ষ নিসর্গে তাঁর প্রতিভা ভূতপত্রী-ও ক্ষীরের পুতুল গড়ে, হাঁসের ঝাঁকে বাংলাময় ওড়ে, কুঁকড়োর গানে জাগে। আমাদের অজাতমৃতমূর্খপ্রায় সংস্কৃতি-তত্ত্বে ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় তাঁর বাংলার ব্রত প্রাথমিক বই। গমনাগমন-এর শিল্প-প্রতিভা শুধু রচনায় নয়, শিল্প-বিচারের অন্তদৃষ্টিতেও অসামান্য। আমাদের নদীমাতৃক মাটির যে সংস্কৃতেতর লৌকিক সরস প্রত্যক্ষধর্মী মানবিক সংস্কৃতি,

দ্বারকা ঠাকুরের গলির পাঁচ নম্বরের শৈশবার্জিত তার জ্ঞান ও জীবনবোধই তাঁর মুখ্য দান, যার স্বীকৃতি ভবিষ্যতে বিস্তৃত।

নিজবাসভূমে পরবাসী সে যুগে অবনীন্দ্রনাথের এই আমাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ নির্ণয় অর্থাৎ নবজাগ্রত আন্দোলনের ঐতিহাসিক মর্যাদা কতখানি তা বোঝা যায় চিত্রের মাধ্যমের বাইরে এই আন্দোলনের খতিয়ানে বিশেষ করে ভাষাবহ কর্মক্ষেত্রে, যথা সাহিত্যে। এই ঐতিহাসিক দৃষ্টির অভাবেই বোধ হয় আজও ভারতীয় ইতিহাস সংস্কৃতির বিচারে এই ব্রহ্মণ্যহীন লোকায়ত পক্ষপাত প্রায় দুর্লভ—একদিক থেকে রাহুলসাংকৃত্যায়ন এবং ক্ষিতিমোহন সেনের কোনো কোনো লেখা ছাড়া। এ তির্যক ইংরেজপক্ষপাতের জন্যেই বোধহয় সাহিত্যবাদী সাহিত্যিকও আপন অজ্ঞাতে অবনীন্দ্রনাথের ভাষারচনার অসামান্য সাহিত্যমূল্য—কি শিল্পমর্যাদায় কি বৈচিত্র্যে, নির্ধারণে দুর্দান্তরকম কার্পণ্য করেন। শিল্প-বিচার বা কান্তিবিদ্যার চর্চাতেও অবনীন্দ্রনাথের লেখা সংখ্যায় বা গৌরবে কম নয়।

অথচ ব্যাপারটা তুচ্ছ নয়, কারণ এ স্বীকৃতির সঙ্গে জড়িত যে শুধু মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত, মাইকেল, দীনবন্ধু, এমনকি তারাশঙ্করের বিচার কিংবা পট বা পাটার আলোচনা তা নয়, এরই সঙ্গে জড়িত আমাদের ইতিহাসের পাঠোদ্ধার, আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের রূপায়ণ। রামমোহনের দেশ, বঙ্কিমের দেশ, রবীন্দ্রনাথের দেশ আরো অনেকেরই তো দেশ, তাছাড়া তার অতীত বাদ দিয়ে কি শুধু উকিল মোক্তারে মাস্টারে কেরানিতেই তার বর্তমান নিঃশেষ? তার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী কি শুধু দিল্লীতেই ফুরিয়ে যায়? এবং যদি ভাবা যায় যে এটা অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাহলে ভুলই হবে। কারণ যদিও অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার বহুধা বৈচিত্র্য আরেক দেশের বৃহত্তর ও মৌলিক রেনেসান্সের কথা মনে আনে—দা ভিঞ্চি বা বেলিনির যুগের কথা, তবু তাঁদেরই মতো অবনীন্দ্রনাথও তাঁর কালেরই মানুষ, অর্থাৎ একা নন।

গগনেন্দ্রনাথের মধ্যে বাংলার জীবন ও জনসংস্কৃতির সঙ্গে এই যোগাযোগেরই আরেক প্রকাশ। ভারতীতে এবং বিশেষ করে "জীবন স্মৃতি"র সহজ কিন্তু মনোরম ব্যঞ্জনময় চিত্রাবলীতেই তাঁর বিলম্বিত আত্মপ্রকাশ। তারপরে বৈষ্ণব ভাবধারায় তাঁর ঐশ্বর্য বিস্তারের অধ্যায়। কিন্তু সে অধ্যায়েই তাঁর হাত ক্ষান্তি মানে নি, এল প্রখর সমাজবেদনাহত ব্যঙ্গচিত্রাবলী এবং যেন একজন শিল্পীর পক্ষে এই যথেষ্ট কীর্তি নয়, গগনেন্দ্রনাথ শুরু করলেন তাঁর তথাকথিত ঘনকাঢ্য

যুগ, ভাস্কর কোণমিতির সাক্ষাৎ কাব্য। আর্টিস্ট যে কি সম্পূর্ণতায় স্বীয় সীমাবদ্ধতার সদ্ব্যবহার করতে পারেন, গগনেন্দ্রনাথের চিত্রাবলী তার আশ্চর্য উদাহরণ।

তারপরে আরেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথ যখন দুহাতে দিলেন উড়িয়ে নব্যভারতীয় ভাববিলাস আর অ্যাকাডেমির যথাযথবাদের দাবি। আমাদের কালের সবচেয়ে প্রচণ্ড মনের উলঙ্গ স্বপ্ন, অফুরন্ত কল্পনা রেখার রঙের অজস্র কিন্তু নিশ্চিত ছন্দে ভাসিয়ে দিলে অশিক্ষিতপটুত্বের পুঁথিগত দ্বিধা, যেমন ভেঙে দিলে রবীন্দ্রনাথেরই বিরাট সাহিত্যকীর্তিলালিত তাঁর শুচিবায়ুগ্রস্ততার, শালীননীতির পুরাণ।

আরেকজন মহৎ শিল্পীর কাজেও এই দ্বৈততার আভাস দেখা যায়, নন্দলাল বসুর বিরাট চিত্রকর্মে। নন্দলালের রূপায়ণে অন্তহীন নব নব বিকাশ, তাঁর নানা রীতির অন্বেষা যে-কোনো শিল্পগোষ্ঠীর গর্বের বিষয়। দীর্ঘ কীর্তির পটে আজও তাঁর কল্পনার সাবেক ঐশ্বর্য কমে নি, অধিকন্তু এই কথাই বলা উচিত যে তাঁর মানস সম্পদের প্রাচুর্যই তাঁকে তাঁর রেখার ও রঙের অমিত ঐশ্বর্যের সাততলা মহলে বারবার নিয়ে যায় রূপের শুদ্ধ মাটি থেকে। নন্দলালের পোস্টারচিত্রে অবশ্য লোকশিল্পের ব্যবহার দ্রষ্টব্য, যেমন তাঁর বাংলার গ্রাম্যজীবন ও নিসর্গের অজস্র চিত্রাবলীতেও তা দ্রষ্টব্য।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে আমাদের নতুন শিল্পান্দোলনে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে প্রদোষ দাশগুপ্তের মতো শিল্পী থাকা সত্ত্বেও চিত্রের অনুরূপ কিছুই বিশেষ কাজ হয় নি। স্থাপত্য তো বটেই এমনকি ভাস্কর্যের প্রসারে সামাজিক সমর্থন আশু প্রয়োজন। আমাদের জীবনযাত্রায়, জীবনের প্রত্যেক স্বচ্ছ উপভোগে কোথায় সে সমর্থন? সে অভাবেই বোধহয় চিত্রকলাতেও এত মৌল রূপ-ভাবনায় শৈথিল্য, কোনো ব্যক্তিগত ত্রুটির চেয়ে বেশি এই ঐতিহাসিক কারণেই।

এইদিক থেকেই যামিনী রায় আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁরই মধ্যে আচার্য অবনীন্দ্রনাথের স্বপ্ন, তাঁর বন্ধু নন্দলালের সাধ সম্পূর্ণ। তাঁর কাজে আমাদের শিল্প রেনেসান্সের পটে বাংলার স্বকীয় সমগ্রতালাভ। এদিকে তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ অ্যাকাডেমিক বা বস্তুতান্ত্রিক রীতির পাকা চিত্রকর, অসামান্য রেখাশিল্পী, আবার বাংলার লোকমানসে ও শিল্পে তাঁর গভীর সাযুজ্য। তাঁর প্রথম যুগের অনলস কঠিন সিদ্ধির মধ্যে তাঁর যে শিল্পমানসের বিপ্লব এল, তার দীর্ঘ ও

বিস্ময়কর বিবর্তনের ইতিহাসে, গ্রহণে ও বিচারেই আমাদের শিল্পের ভাবী সম্ভাবনা।

২. যামিনী রায়

যামিনী রায়ের চিত্রাবলী এতই চিত্রগুণে শুদ্ধ, যে তাঁর বিষয়ে ভাষায় লেখা সক্ষম হলেও মূলত ব্যর্থ হতে বাধ্য। সচরাচর এই চিত্রগুণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আক্রমণে কাবু দেখা যায়। তাই আমরা গল্প না পেলে চিত্রকে দুর্বোধ্য তো বলিই, তার সামাজিক সত্তাও দেখতে পাই না। মাতিসের মতো যামিনী রায়ের দীর্ঘ চিত্রসাধনার বিষয়ে এ কথা বিশেষভাবে সত্য। ফলে আমরা হয়তো তাঁর বিশেষ দু-একটি ধরনের ছবি পছন্দ করতে পারি, কিন্তু তাঁর কীর্তির সামগ্রিক উৎকর্ষ উপলব্ধি আমাদের বোধের বাইরে থেকে যায়।

কারণ মাতিসের সঙ্গেই তাঁর শিল্পস্বভাবের কিছুটা তুলনা সম্ভব হলেও, এক হিসাবে তাঁর বিকাশের বহুবিধ ঐশ্বর্যের তুলনা মেলে খানিকটা পিকাসোরই সঙ্গে, যদিচ পিকাসোর বুদ্ধিখর বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদীর অস্থির কৌতূহল বা পিকাসোর মায়ামমতাহীন গড়ে ভাঙা ও ভেঙে গড়া এক স্বতন্ত্র শিল্পস্বভাবের ইতিহাস।

বাঁকুড়ার এক অন্তর্বর্তী গ্রামে তাঁর জন্ম। লোকসংস্কৃতির অবশেষে ও অপেক্ষাকৃত আঞ্চলিক সচ্ছলতার মধ্যে বেলেতোড় গ্রামে তাঁর শৈশব তাঁর জীবনের বিকাশে নিরর্থক নয়। শিল্পের প্রাণ সন্ধান এবং সামাজিক জীবনের আত্মসম্পূর্ণতার স্বপ্ন তাঁর এই গ্রামীণ পটভূমিতেই আরম্ভ। এরই স্মৃতি তাঁকে ভুলতে দেয় নি কলকাতার নকল বুর্জোয়া জগতের পশ্চিমা প্রাকৃতবাদী শিল্পমার্গের অসারতা। তাঁর নিজের হাতের অসামান্য সাফল্য সত্ত্বেও। কারণ ইওরোপের প্রথাসিদ্ধ শিল্পরীতিতে যামিনী রায়ের কৃতিত্ব ইওরোপের বাইরে অভূতপূর্ব। অবশ্য এই ইওরোপীয় রীতির যুগে তাঁর বিস্তৃত কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী সাধনার প্রাণপ্রতিষ্ঠার কাজে লেগেছে, বিশেষ করে দেশের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন দেহ ও মুখের টাইপের জ্ঞান তাঁর তুলিতে মজ্জাগত হয়ে গেল এই পোর্ট্রেটের যুগেই। এবং রেখাসংক্ষেপের দখলও এসে গেল এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

সুনাম ও পসারের মধ্যে যামিনী রায়ের মানসিক যন্ত্রণার মোড় ফিরল, সন্ধিক্ষণের বিপ্লবী দিকে, ব্যক্তিগত স্টাইল বা রীতির সামাজিক শিকড়ের

অন্বেষায়। প্রথমত রূপান্তরের তাগিদ তাঁর এল তাঁর তৎকালীন শিল্পসাফল্য এবং তাঁর দর্শক-ক্রেতা বাবুসমাজের সম্বন্ধের মধ্যে মানসিক অসারতা বা উভয়ত প্রাণবন্ত শিল্পপ্রেরণার অভাব উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে। দ্বিতীয়ত তিনি দেখলেন যে ঐ পূর্বোক্ত কারণেই আমাদের জেবলী বা উন্মূল শিক্ষিত শ্রেণীর সংস্কৃতিতে ইওরোপের ওস্তাদের ঐতিহ্য চালান করা ব্যর্থ চেষ্টা। তাছাড়া এদেশের কড়া রৌদ্রের আলোয় ছায়াবর্ণাঢ্য প্রথাসিদ্ধ তৈলাঙ্কনের অর্থহীনতাও তাঁর কাছে স্পষ্ট হল।

তখন থেকে তাঁর তপশ্চর্যা, সারল্যের অভিযানে অবিশ্রাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। প্রথমদিকেই তাঁর সাফল্য দেখা যায়,—বহুর মধ্যে একটি ধরনের উদাহরণই দেওয়া যাক, তাঁর সাঁওতাল মেয়েদের বা পুরুষদের মনোরম ছবিগুলি, কিংবা কৃশ বাংলার মা, বাহুতে ছেলে। যামিনী রায় তখনও তেল-রং ব্যবহার করেন, কিন্তু লঘু মসৃণ টানে। এ সময়েই দেখা যায় তাঁর ছবিতে রংগুলির পারস্পরিক সমান চাপের দিকে একটা ঝোঁক। দেখা যায় আকারগত এবং রেখাগত শুদ্ধতা এবং রঙের একটা ভাবব্যঞ্জক গঠনমূলক ব্যবহার।

অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য চিত্রকর হয় আকারের ভাস্কর্যমূলক সমস্যায় কমবেশি ভাবিত থাকেন (সেজান্ থেকে পিকাসোর অনেক কাজ অবধি)* নয়তো রঙের লিপিমূলক ঐশ্বর্যবিস্তারে ঝোঁক দেন (ইম্প্রেশনিস্ট থেকে মাতিসের অনেক কাজ অবধি)। যামিনী রায় চিত্রের গঠনময়তা আর ভাস্কর্যে কঠিন স্পর্শসহতা কখনও এক ভাবেন নি, আবার বর্ণাঢ্য রেখার স্পষ্টতাও তিনি কখনও হারান নি বর্ণের বিলাসে। ভারতবর্ষের শিল্পের ঐতিহ্যে তিনি দরবারী মিনিয়েচর রীতিবিলাসকে কোনোদিনই মূলধারা ভাবেন নি।

তিনি খুঁজেছিলেন মৌলিক আকারের ও সমবর্তী রঙের উচ্ছল রূপায়ণ এবং তা তিনি স্বচক্ষে দেখলেন বাংলার পুতুলের চৈত্যরূপের নিশ্চিত ঋজুতায়, তাঁর ঘরের ও সর্বদেশের শিশুদের শুদ্ধ ভাবগঠনের দৃষ্টিতে, আদিম বর্ণপুঙ্ক্তির রঙীন শক্তিতে। তাই তাঁর পরীক্ষা চলল আমাদের চোখের প্রাথমিক অন্তরঙ্গ জালিধূসরের সারল্যে, যে ধূসর, চোখ খুললেই রূপের কাঠামোতে হয়ে পড়ে আকাশের অনন্ত নীলিমা। এই ধরনের ছবিগুলি আঁকা তুলির একটানে, ধূসর পটভূমিতে ভুসোরঙে ; যামিনী রায়ের চোখের এবং কব্জির ধ্রুব নিশ্চিত শক্তিতে এই সব ছবিতে আসে বিষয়বস্তুর গঠনবেদ্যতা—তা সে মা হোক বা শিশু হোক বা বৃদ্ধ মানুষ বা হরিণ বা বাংলার বিধবা মেয়ে। এবং সেটা

আসে পরিপ্রেক্ষিতের স্তরবিন্যাসে নয়, আসে শুধু অথবা ধূসরের পটে কৃষ্ণ রেখার ধৃতসীমার সবল টানের চাক্ষুষ ব্যাপ্তিতে। এই সব রেখাশরীরের দেহভার হয়তো যাঁরা শুধু পারসীক মিনিয়েচর দেখে কাটান বা যাঁরা তথাকথিত নব্য-ভারতীয় ছবির ভক্ত তাঁদের চোখ এড়িয়ে যাবে, যেমন যাবে তাঁদের কাছে যাঁরা শুধু ক্যামেরার চড়া ছায়াতপে অভ্যস্ত, যে কড়া শাদা-কালোর তুলনাবৃত্তিতে চোখ খোলার মুহূর্তে মানবচক্ষুর পক্ষপাতহীন ধূসরিমার কোনো স্থান নেই।

যামিনী রায়ের প্রতিভা অবশ্য এই সিদ্ধিতে বিরাম মানে নি। যাঁরা তাঁর তুলির অবিরাম রেখার সঙ্গে কালীঘাটের জের-টানা রেখার তুলনা করে সন্তোষ পান যেন তাঁদেরই অধিকতর হতভম্ব করতে তিনি শেষ করলেন বিরাট দেয়াল-চিত্রের একটি গোটা সারি। রামায়ণ বা কৃষ্ণলীলার কঠিন মাধুরীতে এই চিত্রমালার চৈত্যপ্রমাণ মূর্তিগুলিতে এক নতুন সৌন্দর্যের উন্মেষ। বলাই বাহুল্য, যে-কোনো গুণী শিল্পীর মতো যামিনী রায় সর্বদাই পাঠ নিতে প্রস্তুত, এবং বাংলার পট বা পাটা, রেমব্রাণ্ট বা ভানগখ্ কিছুই তিনি তুচ্ছ করেন নি। কিন্তু তিনি চূড়ান্তভাবে নির্বাচনক্ষম সজ্ঞান শিল্পী এবং তাঁর রুচি ক্ষণকালের জন্যও তাঁর তুলিকে ছাড়ে নি, অন্যপক্ষে লোকশিল্পীরা প্রায় অভ্যাসিক কারিগর এবং সুরুচির সমান মাত্রা সচেতনতা ছাড়া না থাকাই স্বাভাবিক। এই বড় বড় ছবিগুলিতে চৈত্যমাত্রিক বলিষ্ঠ আকার যেমন মুখ্য তেমনি এদের আলংকারিক সৌষ্ঠবও অবিচ্ছেদ্য। এই সার্থকতা সম্ভব শিল্পীর হাতের অসামান্য দক্ষতায়, তাঁর চিত্তের একাগ্র অনুসন্ধিৎসায় এবং একান্ত শিল্পী-দায়িত্ব-বোধে আর দেশের লোকের ভালোবাসার উৎসে নিজের ব্যক্তিগত ভালোবাসাকে ডোবাতেই পারলেই। এই ছবিগুলিতে ঘনতা পটসন্ততিতে, বা স্থানযোজনায় এমনভাবে বিন্যস্ত যে শিল্পীর গঠন-সুনম্যতার কর্তৃত্ব আপাতদৃষ্টিতেও স্পষ্ট অথচ তাঁর মূর্তিগুলি বা চিত্রদেহগুলি চিত্রগতই, ভাস্কর্যগত নয় এবং এ ভেদেই তাঁর শিল্প-সিদ্ধির আরেক প্রমাণ।

কিন্তু যামিনী রায় এখানেও থামেন নি। যেন রামায়ণ বা কৃষ্ণলীলার পরিচিত রসাভাসে পাছে তাঁর পরীক্ষা বহির্মুখ থেকে যায়—আসলে অবশ্য এ পরীক্ষা তাঁর মানসের গভীর আবেগবহ দ্বন্দ্বময় প্রেরণাই—তাই শুদ্ধির খোঁজে তিনি খুঁজলেন পুরাণের বাইরে, তৈরি অনুষঙ্গের বাইরে তাঁর চিত্রের উপজীব্য। বাউরী, সাঁওতাল, সাধারণ চাষী, সাধারণ জীবনযাত্রারত মেয়ে-পুরুষ এরা হল তাঁর চিত্রের বিষয়বস্তু। শুদ্ধ চিত্রসাধনায় তারা অবশ্যই নির্বিশেষ, সাধারণ,

কিন্তু তবু তারা টাইপ, প্রতিভূ মানুষ সব। তাদের মুখ ভিন্ন, শরীর ভিন্ন, ভঙ্গী ভিন্ন এবং বাঙালীর কাছে তারা চেনা, আত্মীয়। তাই তারা মনকে এত নাড়া দিয়ে যায়, শুদ্ধ ছবির বেষ্টনীতে প্রত্যক্ষ জীবনের রসাভাসে—মহৎ শিল্পের আপাতবৈপরীত্যগুণে খণ্ডিত সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধের শিল্পগত ডায়ালেক্‌টিকে। বুর্জোয়া স্বার্থে য়ুরোপের শিল্পে যে মানুষে মানুষে ভেদের উপরেই ঝোঁক পড়েছিল গত কয়েকশত বছর ধরে, সে ঝোঁক তিনি শুধু নেতিতে ভাঙেন নি, ভারতবর্ষের বিশেষ ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের কিছুটা সাহায্যে তাঁর সমাধান শ্রেণী-উত্তীর্ণ না হলেও কিছুটা আস্তিকও বটে।

শিল্পের সীমা যামিনী রায় সর্বদাই মানেন, সেইখানেই তাঁর শিল্প সাধনার মুক্তি। আধুনিক পশ্চিমা শিল্পবিদ্রোহীদের কথা তিনি প্লেটোর মতোই মানেন—জ্যামিতির আকারে, ঘন, গোলনলিকা ও উপবৃত্তই হচ্ছে প্রাথমিক রূপকার। তবে, তারপরে, তিনি বলবেন যে শিল্প কিন্তু প্রাথমিক রূপকার নয়, অন্তত মানুষের কাছে। মানুষের কাছে শিল্প প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনের রসায়িত আকারের রূপায়ণ, দর্শনের বা স্মৃতির দৃশ্যের রূপান্তর বা নির্মাণ—অর্থাৎ মানবিক, সামাজিক। তিনি তাঁর বিষয়বস্তুর মৌলিক বস্তুপরিচয় অস্বীকার করেন না। পাবলো পিকাসোর মননী নেতিবাদ বা বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসায় সব সম্বন্ধপাত ভেঙে যায়। পশ্চিম ইওরোপের বুর্জোয়া বিকাশের অন্তিম ক্ষণে সেটাই সংগত, পুনর্নির্মাণের, পুনঃপ্রাণপ্রতিষ্ঠার আগে। এদেশে বুর্জোয়া যুগ আরম্ভে অপ্রকৃত ও বিকাশে অসম্পূর্ণ। গ্লানি তাই বিস্তর, পুনর্নির্মাণে লাভ শুধু দ্রুত মুমূর্ষু লোকসংস্কৃতির বিড়ম্বিত ঐতিহ্যের অবশিষ্ট সুযোগটুকু।

যামিনী রায় সেই ক্ষীণ সুযোগ তাঁর শিল্প সাধনায় সার্থক করেছেন। আমাদের শিল্পীদের মধ্যে ইওরোপকে চিত্রে উপলব্ধি করবার ক্ষমতা তাঁরই সমধিক, এবং তিনিই বুঝেছেন আমাদের দুশো বছরের মধ্যবিত্ত চাকুরিয়া যুগের প্রচণ্ড অসম্পূর্ণতা। এইখানেই তাঁর ক্ষমতার উৎস এবং হয়তো এইখানেই অসম্পূর্ণতার দোটানায় কিছুটা বা তাঁর অতীতের স্বপ্নাততি ও তাঁর ইউটোপিয়া। নিজের সাধনার একক ও প্রবল তীব্রতায় তিনি হয়তো ক্লাইভ হেস্টিংস ডালহৌসি থেকে কংগ্রেস অবধি, রামমোহন থেকে বাংলার প্রগতিতাত্ত্বিক অবধি যে নববাবুবিলাস তাকে একটু বেশি অস্বীকার করেছেন, ভাঙা সেতুর প্রশ্নটা বড় করেন নি, মানেন নি ঐতিহাসিক প্রয়োজন হিসাবে। বেলিনস্কি একবার বলেছিলেন যে রুশ মহাকবি পুশকিন অর্ধেকটা জাতীয় কবি। কথাটা তখন সত্যই

ছিল, আজকেই শুধু দেশের মানুষের সামগ্রিকতায় জাতির অখণ্ডতায় রুশদেশের সেই পুশকিনকেই বলা যায় জাতীয় কবি। রুশ বুর্জোয়ার তুলনায় বাংলার অসম্পূর্ণ বুর্জোয়া আরও বিচ্ছিন্ন, তাই রবীন্দ্রনাথের বিরাট সার্বভৌমত্ব আজো ইতিহাসে ভবিষ্যতে নিহিত, কর্মের ভাবী সিদ্ধির পটে সম্ভাবনায়। রুশদেশে রোমান্টিক বিদ্রোহী পুশকিনের চেয়েও কথাটা মাউন্টব্যাটেন-প্যাটেল যুগে এখানে আমাদের পক্ষে আরো কঠিনভাবে সত্য—রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক বিদ্রোহী যদিচ আস্তিক প্রতিভার অসামান্য ব্যাপ্তি সত্ত্বেও।

সম্ভবত মহৎ শিল্পীর আবশ্যিক একাগ্রতার এই সমাধানের জটিলতার প্রশ্নে ঝোঁক কম পড়ে। সে যাই হোক, যামিনী রায়ের এইসব চাষী মজুর বাউল ফকির, লালপাখি হাতে নীল চাষার ছেলে, কামার, লাঠি হাতে বা টোকা মাথায় কৃষক, গৃহস্থ, বৃদ্ধা প্রবীণ ও নবীন, কুমারী ও বিবাহিতা মেয়েরা মায়েরা—এরা সবাই দেশের চেনা মানুষ, যামিনী রায়ের দীর্ঘ পরিচয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষের মমতার শুদ্ধ রূপান্তর। এবং এসব ছবিতে রঙের সেই প্রয়োগ যাতে চোখ পটের উপরে ঘুরে মরে না বস্তুর গোটা রূপের সন্ধানে ভ্রাম্যমাণ যোগবিয়োগে। যামিনী রায় এই সিদ্ধি অর্জেছেন তাঁর বৈচিত্র্যের সীমায়নে এবং বিশেষ করে প্রাণময় রেখাগুচ্ছির মধ্যে রং-গুলির সমলেপ চাপে এবং পারস্পরিক সংগতিতে: তার দ্বারা তাঁর ছবি একটা সামগ্রিক সাযুজ্য লাভ করে, এমন একটা সত্তা যা স্পষ্টত ন্যস্ত এবং চাক্ষুষভাবে সাক্ষাৎবোধ্য, সান্ধ্য আলোকচ্ছটায় প্রশান্ত স্বচ্ছ সীমাসংহত একটা সমগ্র নিসর্গদৃশ্যের মতো।

এই একদৃষ্টিভাত রূপ যে সম্ভব হয়েছে তার কারণ অবশ্যই মূলত তাঁর রীতি-বিন্যস্ত রিয়ালিসম্ বা বাস্তবিকতা, যা তিনি অর্জন করেছেন প্রাকৃতবাদের বা সাংবাদিকতার বিসর্জনে, সম্ভব হয়েছে কারণ তাঁর ছবিতে প্রতি অংশ প্রাণ পায় প্রতি অংশের সঙ্গে প্রতিসংস্থানে, মামুলী চিত্রের ভারসাম্যে বা বাদপ্রতিবাদের জ্যামিতিক বা যান্ত্রিক কৌশলের রসাভাসে ততটা নয় যতটা সমগ্রোৎসারী সক্রিয় অঙ্গাঙ্গিতায়, রঙেরই স্বকীয় গুণের সচল সম্বন্ধপাতে, যা তাঁর অনবদ্য রেখাকর্তৃত্বের সঙ্গে হাতবাঁধা।

প্রাচ্যশিল্পে এই রং ব্যবহার খুব প্রচলিত রীতি নয়। ভারতীয় চিত্রে এ আমরা কদাচিৎ দেখি, কিছুটা হয়তো বাশোলীচিত্রে এবং কিছুটা অজন্তায়। কিন্তু অজন্তা ভারতশিল্পে একটা দুর্লভ এবং অসাধারণ কীর্তি; অজন্তা, বলা যায়, স্থাপত্যচিত্র। তাছাড়া অজন্তায় পাওয়া যায় তার পরিমাণ বা আকার সত্ত্বেও

মধ্যযুগের পুঁথি সচিত্রকরণের গাল্পিক চলমানতা। যামিনী রায়ের ছবি যেন স্থানসন্ততিতে কাটা কাটা ফ্রেম থেকে বেরিয়ে আসা স্নায়ুতে গাঁথা মানুষের রূপ। তাছাড়া অজন্তার ওস্তাদদের পাথরের গায়ে যে উপরভাসা বর্ণাভাস আনতে হয়েছিল তাও তাঁকে আনতে হয় নি।

যামিনী রায় যেসব নানারকম টেকনিক প্রয়োগ করেন বা তিনি কিভাবে টেম্পেরা বা তেলরং তৈরি করেন সেসব আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু মনে রাখা দরকার যে আপাত-বর্ণলয়হীন টেম্পেরা রঙে তৈলচিত্রের ভাস্বরতা ও গভীরতা আনবার অপূর্ব নৈপুণ্যে, যাঁরা তাঁর রেলওয়ে লাইনের বা বাগবাজারের গলি বা বাঁকুড়ার বাড়ি বা দক্ষিণেশ্বরের ছবি দেখেছেন তাঁরাই অবাক না হয়ে পারেন না। এবং এ প্রসঙ্গে সচরাচর অবহেলিত জমি তৈরির প্রয়োজনীয় কাজেও তাঁর কৃতিত্ব স্মরণীয়। রঙের ও কাপড়ের বা কাঠের বা বোর্ডের এই বিজ্ঞান তাঁর নখদর্পণে বলেই তাঁর নৈসর্গিক ছবিগুলি এত আশ্চর্য সুন্দর। তিনি অবশ্য এগুলিকে তাঁর খেলা বা ব্যায়াম মনে করেন, যদিচ যে-কোনো ইংরেজ চিত্রকর এরকম কৃতিত্বে খুশিই হতেন।

এ ছাড়াও যামিনী রায়ের বহু ছবি আছে : গরু, ঘোড়া, হরিণ, বাঘ, হাতি—দীপ্তবর্ণ ; শিশুর মতো সরল কিন্তু যে নিশ্চিত সরলতা চরম বিদগ্ধ ও অভিজ্ঞ কলাকুশলীরই আয়ত্তে। তাঁর বাইবেল-পুরাণঘটিত ছবিতে এই কুশলীপনার সর্বপটীয়সী প্রতিভা স্পষ্ট। খৃষ্টঘটিত এই চিত্রগুলিতে তাঁর বৈষ্ণব চিত্রেরই কারুণ্য ও স্নিগ্ধতা, আবার বাইজানটীয় ও রুশ আইকনের সমতুল্য তীব্র আততিও তাতে মেলে।

বাগবাজারের নোংরা গলিতে তাঁর বাড়িতে যাওয়া একটা আনন্দের উৎসব ছিল। এখন তাঁর ডিহি শ্রীরামপুর লেনের বাড়িতে যাওয়াও আনন্দের ব্যাপার, আমাদের ভবিষ্যতের সুখীজগতের শান্তিময় একটা সপ্তবর্ণ আভাস।

যামিনী রায়ের চিত্রসাধনায় যে শুধু আমাদের শিল্পের মুক্তি, তাই নয়, আমাদের সাধারণ বাংলার মানুষের চোখের আনন্দে তিনি আমাদের মনোজগৎকেও রূপ দিয়েছেন—দৃশ্যপথে। এবং এই আনন্দ যেহেতু দেশের আনন্দে, মানুষের শান্তিতে প্রসাদে মৃন্ময় ; তাই আমরা সবাই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

মাতিসের কথায় এই অক্ষম পরিচিতির আরম্ভ, তাই দিয়ে শেষ করি। লুই আরাগঁ বলেছেন, মাতিস হচ্ছেন এ শতকের ফ্রান্সের তথা সুখের বা আনন্দেরই চিত্রকর। এক শতাব্দী ধরে এই আনন্দ নাকি ইওরোপে একটা নতুন ধারণা।

একশো বছরে নাকি এই তারাটি আজ (১৯৪৮) মানবআকাশে ধ্রুব হয়ে উঠেছে। এবং মাতিসের চিত্রাবলী নিশ্চয়ই আনন্দের যুক্তি ও প্রবল সমর্থন। মনে হতে পারে চিত্রিত বা কল্পিত এই আনন্দের ধ্যানে দর্শনে আনন্দের জন্ম লড়াই থেকে লোকে নিরুদ্ধ হবে, আরাগঁ কিন্তু তা অস্বীকার করেন। তাই তিনি মাতিসকে মনে করেন সাৎর্‌-মার্কা জ্বরের যম, মনে করেন অতীতের জীর্ণ রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, আজকের আনন্দে কর্মিষ্ঠ মিছিলে মাতিস যেন একটা বিরাট নিশান।

যামিনী রায়ের শান্ত ও রঙীন আনন্দের চিত্রলোক আমাদেরও যেন সেই নিশান নির্দেশে সমৃদ্ধ করে—আমাদের দ্বিধান্বিত অসম্পূর্ণতায়, গৌণতার গ্লানির মধ্যে অপরাজেয়। মাতিস বলেছিলেন, শ্রমকাতর লোককে বিশ্রামের শান্তি দিতে চাই। যামিনী রায় চান ঘরোয়া মানুষকে আনন্দ দিতে। এ আনন্দ শুধু বিশ্রাম নয়, এ প্রতিবাদে ভেঙে গড়ারই পরোক্ষ প্রেরণা।

৩. ক্যালকাটা গ্রুপ

আমাদের ক্ষীণ শিল্পসংস্কৃতির জগতে এবারের, ১৩৫৫ সালের শীতকালের, এই শিল্পপ্রদর্শনীটি একটি প্রাণময় ঘটনা। কলকাতা গোষ্ঠীর শিল্পোৎকর্ষ বিষয়ে নতুন করে পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই, সম্যক আলোচনার জায়গাও এখানে হবে না। যামিনী রায়ের কীর্তির পরে এঁরা এবং এঁদের সহকর্মীরা ভারতশিল্পের আশা। সম্প্রতি শীলা অডেনের প্রদর্শনী দেখেও এই আশা সবল হয়। বোম্বাই-এর চিত্তপ্রসাদের কাজও আশা করি আমরা দেখতে পাব। কলকাতা গোষ্ঠীরই এ-বিষয়ে সংগঠনে অগ্রণী হওয়া চাই। কারণ প্রদর্শনী সংগঠন করতে হলে যে রুচি ও কর্মদক্ষতা প্রয়োজন, তা যে এঁদের আছে, এবারে তাঁরা তার প্রমাণ দিয়েছেন।

বস্তুত, কলকাতা গোষ্ঠীর এবারের প্রদর্শনী আমাদের পক্ষে একটা যুগান্তকারী ব্যাপার। এরকম আলো ও দেয়ালের ব্যবহার, এরকম ছবি টাঙানোর বিন্যাস —সেই একটা রুচির শিক্ষা ও আনন্দের উৎস।

তাছাড়া, ব্যক্তিগত শিল্পী হিসাবে তাঁদের যে সজীব প্রতিরোধতীব্র টেক্‌নিকের বিস্তার ও জীবনাভিজ্ঞ আমাদের পূর্বপরিচিত সেসব গুণাবলী এবারেও দ্রষ্টব্য। গোপাল ঘোষের রঙের ছবির আকার-বিকাশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পরিতোষ সেন মনে হয় তাঁর দ্রুতরেখার চাপল্য এবং উজ্জ্বল রঙের আপতিক

দীপ্তির দ্বিধা প্রায় কাটিয়ে উঠলেন স্বকীয় রূপায়ণের মর্যাদায়। প্রাণকৃষ্ণ পাল তাঁর মাভনায়, স্টীল লাইফে, ঘোড়দৌড়ে, সর্বোপরি তাঁর তৈলচিত্র : চুম্বনে তাঁর সুকুমার শমিতপ্রতিভার বিকাশ দেখিয়েছেন গভীরতর পারম্পর্য অন্বেষণে। অবনী সেনের ছবিগুলিতে রুচির অনিশ্চয়তা থাকলেও তাঁর রঙের জৌলস ও মোটা কর্মের সন্ধান সম্ভবনাময়। রথীন্দ্র মৈত্র হয়তো গত বছরের তুলনায় বিস্ময়কর কিছু দেন নি, কিন্তু তাঁর বিন্যাসের বৈচিত্র্য এবারেও স্পষ্ট : কাশ্মীরের দুঃখ ও নমাজ থেকে রাস্তার কাক, আর লৌকিক শিল্পের বর্তুলে বর্তুলে চটকদার মুরগীপরিবারে অবধি। প্রদোষ দাশগুপ্তের পাকা ভাস্করের হাত ও মনন অল্প যে কটি কাজ তিনি দিয়েছেন, তাতেই স্বপ্রমাণিত। কমলা দাশগুপ্তের সমাহিত নৈপুণ্যে মুগ্ধ দর্শক তাঁর হাতের কাজ আরো দেখবার দাবি করে। নীরদ মজুমদারের কাজ প্রবাসজনিত কারণে এবারে অনুপস্থিত। তাঁর সবল ছবির অভাব স্পষ্টই বোধ করলুম।

এই ক'জন শিল্পী যে আমাদের গলিত ভদ্রলোকসমাজের এবং তার জীর্ণ শিল্পধারার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অভিযান চালিয়েছেন, সে স্বকৃতি আমাদের প্রগতিবাদীরা নিশ্চয়ই তাঁদের দেবেন, কারণ প্রতিরোধের দ্বন্দ্বাত্মক আন্দোলনেই এ শিল্পশুদ্ধির উৎস ও বিকাশ। অন্ধ ও কুরুচিজীর্ণ, দুর্বল রং ও রেখা ব্যবহারে বা মডেলিঙে যে প্রত্যেক্ষের সংঘাত বা যন্ত্রণা থেকে পলায়ন, সে শিক্ষাবিরোধী এবং নিশ্চেষ্ট গতানুগতিকতা বা অ্যাবস্ট্রেক্শন বা পরোক্ষতা এবং অন্যপক্ষে সজাগ সংবেগ্য চোখের মনের দ্বন্দ্বময় আততিতে যে তথাকথিত এবস্ট্রাক্ট বা কৈলাস রূপায়ণ এ দুইকে একমূল্যে দেওয়া পেতিবুর্জোয়া মনেরই প্রগতিছদ্মবেশ। সেদিক থেকে প্রগতি বা এমন-কি মার্কসবাদের নামাবলী পরিহিত সমালোচকের ও কটু সমালোচনা শিল্পীদের গায়ে মাখার দরকার নেই। এই প্রসঙ্গে প্রবীণ মার্কসবাদী শিল্পী ও সমালোচক জুর্দ্যাঁর কথা স্মরণীয়। কমরেড জুর্দ্যাঁ বলেছেন :

এটা সেই ছোট সমস্যাটারই সঙ্গে জড়িত, যেটা মব্লাঁ (দার্শনিক, সমালোচক এবং লা পঁসের সম্পাদক) ও আমি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছি। আমরা অনেক বিষয়ে, বিশেষ করে শিল্পের সামাজিক উৎসের বিষয়ে জ্ঞান সন্ধানের স্বল্পতা সম্বন্ধে একমত। যে রিসার্চে শিল্পী ও তার পারিপার্শ্বিক, শিল্পরচনাটি এবং তার ধারণা ও উপলব্ধির কার্যকারণাবলী, সিম্ফনি বা কবিতা বা মূর্তি বা ছবিটি এবং তাদের অবস্থানিচয়ের মধ্যে সম্বন্ধপাত অকাট্যভাবে প্রমাণ করা যায়, সে বিষয়ে রিসার্চ অল্পই হয়েছে। কার্যকারণের বা হেতু ও ফলের সম্বন্ধ, বিশেষ

কোনো এক ক্ষেত্রে নির্ণয় করা আমার মতে বড়ই সূক্ষ্ম জটিল ব্যাপার। হেতুগুলি প্রায়ই এত মধ্যস্থতাসূচক (মেডিয়েট্স্) এবং কার্যফল এত বেশি অপ্রত্যাশিত হয় যে সততাসম্পন্ন কোনো পরীক্ষকের পক্ষে সরলতাবাদী এবং অতিসরলীকৃত ব্যাখ্যায় সন্তোষ প্রচার করা সম্ভব নয়। ঐ রকম ব্যাখ্যায় মিষ্টিক্ বা অতীন্দ্রিয় বিশ্বাসের পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে, কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমালোচনার তা অন্তরায়, ভিত্তির অখণ্ডতার বিষয়ে এ মত নিজেই অনিশ্চিত, কাজেই তা বৈজ্ঞানিক সমালোচনায় অকাট্য প্রমাণ হিসাবে অব্যবহার্য। এই দুর্বলতা থেকেই থীসিস আসে : সেজান্ বুর্জোয়া, অতএব তাঁর শিল্প একান্তই বুর্জোয়া, তাঁর শিল্পরচনা বুর্জোয়াসির লালাক্ষরণ, বুর্জোয়া মানসের একটি প্রত্যঙ্গের প্রতিবিম্বমাত্র। আমার মনে হয় এই থীসিস্ কোনো বিবেকসম্পন্ন বিশ্লেষণে আসছে না, আসছে বরং কিঞ্চিৎ মতবাদ-লাগানো এক এপ্রায়োরিস্‌ম্ থেকেই, যার আশ্চর্য মিল অদৃষ্টবাদ গ্রহণের সঙ্গে (ফাতালিতে)। এ মত থেকে কি ন্যায়সংগত তত্ত্ব দাঁড়ায় না এই যে মানুষ ইতিহাস করে না, শুধু ইতিহাস তৈরি করে দেয় মানুষ? যদি কেউ বলে যে সেজান্ যেহেতু বুর্জোয়া সেই হেতু বুর্জোয়াশ্রেণীপ্রত্যাশিত শিল্প থেকে চূড়ান্ত রকম ভিন্ন শিল্পসৃষ্টিতে অপারগ, তাহলে সে একই ঘায়ে মার্কস্ যে বুর্জোয়া চিন্তার লৌহবন্ধন থেকে মুক্তি অর্জন করতে পারতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ প্রচার করে বসে। মার্কসের চিন্তা কোনোমতেই বুর্জোয়া নয়। সেজানের ছবিও নয়। (লা পঁসে, ২১ সংখ্যা)।

তাই তো সেজানের ঘরোয়া ছবি, আপেলগুলি অনেক বেশি প্রগতির বাহক, সমসাময়িক অনেক তথাকথিত রিয়ালিষ্টিক্ ও জনপ্রিয় শিল্পীর চেয়ে, যাদের জুর্দ্যাঁ বলেছেন কেক্‌বানানেওয়ালা।

কলকাতা গোষ্ঠীর কাছে এবারে যে আবেদন আমরা জানতে পারি সে হচ্ছে যে তাঁরা সন্ধানের যে স্তরে পৌঁছেছেন সেখানে তাঁরা যেন এখন ব্যক্তিস্বরূপের গভীরতায় জারিত কালঘন গভীরতার দিকে আরো বেশি মন দেন। সেটা সম্ভব হবে যখন তাঁরা চিত্রের উপর ত্বকের সমস্যা থেকে আরো সমগ্রতার সমস্যায় মন দেবেন, যখন প্রত্যক্ষ বহির্বিশ্ব, বস্তুজগৎ বা সমাজ তাঁদের চোখ থেকে মানস অবধি আক্রান্ত করবে এবং সেই দ্বন্দ্বকেই যখন তাঁরা আহ্বান করে স্বকীয় চৈতন্যের ও রূপায়ণের গভীরতায় জারিত করবেন। দর্শকের চাই ধৈর্য, বৈপ্লবিক ধৈর্য, কিন্তু শিল্পীরাও যেন সাধনার ধৈর্যভঙ্গ করে শুধু প্রদর্শনীর চমকে আমাদের দৈন্য দূর করার কাজে স্ববিকাশ রোধ করে থমকে না থাকেন।

৪

বাংলা সাহিত্যের ধারা

বাংলা সাহিত্যের বর্তমান ধারা নির্ণয়ে সাহিত্যের ইতিহাস নগণ্য তো নয়ই, বরঞ্চ প্রথমেই বিবেচ্য। অবশ্য এ বিবেচনা শ্রমসাপেক্ষ এবং সাহিত্যনিষ্ঠা ও বোধ ছাড়া এ বিবেচনা শুধু পণ্ডশ্রম নয়, ভ্রান্ত নির্দেশও পরিণত হতে পারে। বিপদ আছে দুই দিকেই। পাণ্ডিত্যের অচলায়তনে উৎস ও মূল্য, বিকাশের সন্ধান ও পুরুষার্থ এক হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে; যার ফলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শুধু অতীতের অভ্যাসিক দিকটাই গ্রহণে নিঃশেষ হয়ে যায়; তখন চণ্ডীদাস বা কবিকঙ্কণ বা আর কোনো মহাজনকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের চেয়েও উৎকৃষ্ট কবি। আবার অন্যদিকে ভয় থাকে আমাদের বিচ্ছিন্ন, ইংরেজি আমলের মধ্যবিত্ত শিক্ষাদীক্ষার আত্মসর্বস্বতার দরুন উনিশ শতকেই বাংলা সংস্কৃতি তথা বিশ্বসংস্কৃতিরই আরম্ভ ও শেষ কল্পনায়। অথচ সাহিত্যের ধারা আজ জ্ঞানত সত্যই দীর্ঘ সংগ্রাম ও বহুবিস্তৃত যোগাযোগের বিকাশের ধারা। এবং সে ধারায় রবীন্দ্রপ্রতিভার মতো মহৎ কীর্তির বিচার পূর্বাপরহীন নয়, অন্তত সাহিত্যের অর্থাৎ তার কর্মঠ বিকাশেব আলোচনার স্তরে।

জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ তাই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাঁর বই 'বেঙ্গলি লিটেরেচর' যে শুধু পণ্ডিতী পুস্তকজগতে আশ্চর্যরকম সুপাঠ্য দান, তাই নয়, তাঁর মতো সাহিত্যিক রুচি ও বোধ এবং জ্ঞান আমাদের দেশে দুর্লভ। তদুপরি, তাঁর দৃষ্টি ঐতিহাসিক, সে হিসাবেও তিনি অগ্রগণ্য। অবশ্য দীনেশ সেন মহাশয় অসামান্য উৎসাহে ও শ্রমে যে যুগান্তকারী কাজ করে গেছেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে বা বৃহৎবঙ্গে, তারই পটভূমিতে এই গ্রন্থ রচনা সম্ভব হয়েছে। ঘোষ মহাশয় এনেছেন তাঁর সরস লেখনী ও সজাগ মনের সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের মান বিচার এবং মধ্যযুগ থেকে উনিশ শতকের বিচারে প্রায় মার্কসীয় ঐতিহাসিক চৈতন্য।

তাই তিনি সূত্র খুঁজেছেন নৃতত্ত্বের জ্ঞানব্যবহারে, বাংলার মিশ্রিত আরম্ভে,

কোল-দ্রাবিড় মোঙ্গল-আর্যের তথাকথিত বর্ণসংকরতায়। এ সূত্র আপাত-দৃষ্টিতেও আলোকদান করে, যথা পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণ পার্থক্যবিচারে পশ্চিমের দ্রাবিড় মিশ্রণের প্রাধান্য ও পূর্বে মোঙ্গলের প্রভাব বিবেচ্য। বলাই বাহুল্য এ বিচারে আর্য কিছু একটা কালাতীত স্থির সংজ্ঞা নয়, কারণ ভারতবর্ষে আর্য প্রসার ক্রমান্বয়ে অনার্যের সংঘর্ষেও সংযোগ আততি ও আত্মসাৎকরণের দীর্ঘ ও নব নব বিন্যাসের ইতিহাস; জ্যোতিষবাবু ঠিকই বলেছেন: বাংলার উপাদান এসেছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়তই অনার্য প্রভাবে; শেষোক্তটি এসেছে অনার্য-আক্রান্ত সংস্কৃত ও প্রাকৃত থেকে। কথাটা মনে রাখা দরকার, ভাণ্ডারকরের মতো পুরোধা পণ্ডিতব্যক্তিও এই দ্বন্দ্বময় সংযোগের কথা মনে রাখেন নি বলেই, অনার্য শিবের হিন্দুসমাজে অভিযানের ব্যাখ্যা খুঁজেছেন শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদের রুদ্রমহাদেবের উল্লেখে, যেন একটি যুগের একটি মাত্র গ্রহণস্বীকারে ও রূপান্তরেই এই অভিযান শেষ হয়ে গেল। কৃষ্ণ-বাসুদেবের ইতিহাস বিচারেও সেকালে এই অসম্পূর্ণতা দ্রষ্টব্য। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় এই অসম্পূর্ণতা অনেকটা দূর করেছেন, আশা করা যায় এ বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞানের সাহায্য আমরা আরো বিস্তৃতভাবে পাব।

আমাদের প্রয়োজন আপাতত সেই বিচার যাতে এই সংঘাত-সংযোগে বহমান ও পরিবর্তমান সাংস্কৃতিক বিন্যাসের ধারার রূপ স্পষ্ট হবে এবং বর্তমানের সাংস্কৃতিক রূপায়ণের চেষ্টায় অপচয়হীন নির্দেশ দেবে। যাতে শুধু ঋগ্‌বেদীয় রুদ্র ও শিবের যোগ নয়, রুদ্রমহাদেবের বাংলার ঘরোয়া মানবিক শিবের গাজনে পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যাবে, স্পষ্ট হবে মথুরা-দ্বারকার বাসুদেবের গৌড়ীয় বৃন্দাবনে রূপান্তর। বাংলার এই লৌকিক আততির স্রোত কিছুটা ইতিহাসের এ [illegible]ই বিষয়, কিছুটা হয়তো বর্মতত্ত্ব এবং কিছুটা সাহিত্যগতও। দ্বিতীয় বিচা[illegible] সন্ধানে শশিভূষণ দাশগুপ্তের বাংলার অপজ্ঞাত ধর্মসাধনা বিষয়ে বিরাট বইটি নিশ্চয়ই কার্যকর, কিন্তু তিনিও আচার-অনুষ্ঠানের দিকে মন দেন নি এবং এ অবহেলার কারণ দেখিয়েছেন সেগুলির আদিবাসী উৎসে। সেদিক দিয়ে বিস্ময়কর কাজ করেছেন এবং সমানে করে যাচ্ছেন ভেরিঅর্ এলউইন। তাঁর এবং আর্চর, গ্রিগ্‌সন বা হাইমেন্‌ডর্ফের কাছে আমাদের ভাবী ইতিহাসকার এবং সাংস্কৃতিক কর্মী ঋণস্বীকারে কুণ্ঠিত হবে না। এলউইনদের নিষ্ঠা ও বিরাট কর্মক্ষমতা শুধুই শ্রদ্ধেয় নয়, সাক্ষাৎ সাহায্য করবে, যদি তিনি বা সহকর্মীরা তাঁদের আদিবাসী-তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে আমাদের অর্থাৎ সাধারণ ভারতীয়ের কথা মনে

রাখেন। আর্য-অনার্য, বর্ণ-বর্ণেতর হিন্দু, আদিবাসী, হিন্দু মুসলিম ইত্যাদি নানা সুবিধাজনক ভাগে সেকালের ইংরেজ আমাদের ভাগ করেছিল। আশা রাখি, সে ভ্রান্তির জের এলউইন বা আর্চর তাঁদের ভারতীয় সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের মহৎ সূচনায় দূর করে দিয়ে তাঁদের মূল্যবান গবেষণা ও রচনা কথঞ্চিৎ দিশাহারা আর থাকতে দেবেন না। এখনও মনে হয় এঁরা তথাকথিত বর্ণহিন্দু নামক প্রত্যয় থেকে তাঁদের আদিবাসীদের মৌলিক বিভাগের উপরেই তাঁদের অসাধারণ গবেষণা ও গ্রন্থরচনার ভিত্তি গড়েন। অবশ্যই ইতিহাসের পর্বে পর্বে বিভেদের স্তরগুলি গৌণ নয়, কিন্তু নব নব যোগাযোগের স্তরগুলিও মৌল। তাছাড়া এতদিন যে মহেনজোদারো, চন্হুদারো বা হরপ্পাকে একটা আকস্মিক ঘটনা বলে নিশ্চিত হবার দিকে য়ুরোপীয় পুরাতাত্ত্বিকের ঝোঁক ছিল, সে ঝোঁকও নর্মদা উপত্যকায় এবং দক্ষিণাপথে প্রাচীন সভ্যতার নানা আবিষ্কারে ক্রমেই ভিত্তিহীন প্রমাণিত হচ্ছে। আপাতত হয়তো আমরা সব কটি ঐতিহাসিক সম্বন্ধপাতে অক্ষম, কিন্তু তারও আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

অধিকন্তু, এলউইন বা আর্চর যদি তাঁদের আদিবাসীতত্ত্বের স্বয়ংসর্বস্বতা ত্যাগ করে, আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী বিচারের মানদণ্ড ছেড়ে ভারতীয় অপভ্রংশ নামে অপখ্যাত ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিচারে নেন, তাহলে নৃতত্ত্ব তথা সাহিত্য শিল্পবিচার দুয়েরই লাভ। তাহলে গোণ্ডী বা সাঁওতাল বা উরাওঁ কাব্যের মধ্যে সংস্কৃত প্রথাসিদ্ধ রূপবর্ণনা বা উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যাখ্যায় কোনো রহস্যের সাহায্য নিতে হয় না, কোনো কোনো আচার ব্যবহার বা দেহতত্ত্বঘটিত ধারণাও এই প্রসঙ্গে বোধ হয় অর্থাৎ সংলগ্ন হয়। এলউইনের অপূর্ব চিত্রসম্ভারেই প্রমাণ করে যে মহেনজোদারোর ব্রন্জ্ নর্তকী থেকে শুরু করে ভারতীয় পাথর বা ব্রন্জের মূর্তির শরীরবিন্যাস আদিবাসী সৌষ্ঠবেরই প্রতিবেশী। তাছাড়া পাথরের কাজ, কাঠের কাজ, সংসারের জন্য নানান হাতের কাজের বিস্ময়কর উৎকর্ষ প্রমাণ করে যে এই যন্ত্রের, টুলসের ব্যবহারে যারা অগ্রগত, তারা জাতিগতভাবে পশ্চাৎবর্তী মাত্র নয়, ভৌগোলিক ও গোষ্ঠীগত ব্যবধান সত্ত্বেও।

সেই জন্যই একটু অবাক লাগে যখন এঁরা দেবর-বৌদিদির রসিকতার সম্বন্ধ শুধু আদিবাসীজগতেই সীমাবদ্ধ মনে করেন বা যৌনজীবন সম্বন্ধে সুস্থ স্বাধীন ধারণা মনে করেন ভারতের আদিম জাতিদের এবং ইওরোপের আধুনিক শিক্ষিতজনের মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ। এলউইনের মুড়িয়া গোটুলের উপরে এই বিরাট

গ্রন্থে আমরা আমাদের উপকারের দিকটা থেকে নতমস্তকই হব। মুড়িয়া গোটুলের বস্তুত যে আচার অনুষ্ঠান তা যে ব্যভিচার নয়, সেকথা বাংলাদেশে যেখানে সহজিয়াসাধনা একদা শক্তিশালী ছিল সেখানে মানা শক্ত হবে না। অথচ এই গোটুলের বিষয়ে এলউইন আশ্চর্য পরিশ্রমে তথ্য সংগ্রহের শেষে যে কারণ দেখিয়েছেন তা এক হিসাবে নাগরিক সভ্যতার অবক্ষয়েরই আভাস নয় কি? পিতা-মাতা যেখানে প্রজননক্রিয়াকে বলে লজ্জাকর আদিম কর্ম, সেখানে কি আদিবাসীর আদিত্ব অবিমিশ্র?

এদিকে থেকে আর্চরের উরাওঁ কবিতা ও জীবনের বিষয়ে এই দ্বিতীয় মূল্যবান 'দি ডাভ অ্যাণ্ড দি লেপার্ড'-এর একটি বিশেষত্ব উল্লেখ করে আমাদের মূল বিষয়ে ফিরে যাই। আর্চর কবিতাগুলির প্রতীকী রূপ আলোচনার প্রসঙ্গে যে দেশ-বিদেশের কবিতার তুলনা দিয়েছেন তা খুবই উপভোগ্য ও শিক্ষাপ্রদও বটে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় যে উরাওঁ প্রতীকের তুল্য তিনি এলুয়ার, ডাইলান টমাস্ থেকে এলউইনের বৈগা, গোণ্ডী অবধি খুঁজেছেন; তবু—আমার কথাটি ফুরোল নটে গাছটি মুড়োল—এ বাংলা ছড়ার সাদৃশ্য তিনি পান নি এই উরাওঁ কবিতাটিতে:

ও রাখাল, কেন বাঁশি কাটিস্? গরু কেন আসে না? গরু, কেন আসিস্ না? ঘাস কেন গজায় না? ঘাস, কেন গজাস না? বৃষ্টি কেন পড়ে না? বৃষ্টি, কেন পড়িস্ না? ব্যাং কেন ডাকে না?—ইত্যাদি।

জ্যোতিষবাবু দেখিয়েছেন আর্যেতর বাংলার স্থান কোথায় ছিল। এবং বাংলা এখানে বিহার থেকে আলাদা নয়। তৈর্থিকীয় বা ব্রহ্মণ্যবিরোধী বৌদ্ধ জৈন ধর্মবাদগুলির জন্ম এই অঙ্গবঙ্গেই। আবার পরের যুগে বৈষ্ণববাদ এবং ধর্ম, নাথ, চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি সংঘটিত লৌকিক ধর্মও এই সাধারণ জনেই উৎস ও শক্তি পেয়েছিল। বাংলার এই উদার পরিগ্রহীতা স্বভাবেই পরের যুগে হিন্দু ও মুসলিমের সমন্বয় সম্ভব হয়েছিল। এই লৌকিক চাপের সঙ্গে সংস্কৃতের যোগাযোগের রাজধানী চম্পা. গৌড়, নদীয়া।

ঐতিহাসিক বিকাশের চর্চায় সামাজিক বা অর্থনৈতিক যেটুকু তথ্য আমরা পাই, জ্যোতিষবাবু তাও অবহেলা করেন নি। কালাপানির কাছে বলেই, ব্যবসা-বাণিজ্যের চাপে গৌড় থেকে নেতৃত্বের ক্ষেত্র সমুদ্রের কাছে নবদ্বীপে দক্ষিণ এল। এই দ্বন্দ্বময় প্রগতি তিনি ধর্মবিচারে তথা সাহিত্যবিচারেও ভোলেন নি। বৈষ্ণবধর্মের গতিহীনতার দিকটা তাই তিনি সম্যক আলোচনাই করেছেন যদিচ

বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে এই বৈষ্ণবপ্রভাবান্বিত পঞ্চদশ ষোড়শ শতককে তিনি রেনেসাঁসেরই তুল্য বলেন। তারই পটে তিনি ইংরেজি আমলের খণ্ডিত নাগরিক মধ্যবিত্ত জাগরণের পরীক্ষায় তাঁর আলোচনা শেষ করেছেন।

হয়তো তিনি সংস্কৃত প্রভাব বিষয়ে সব জায়গায় সমান অবহিত থাকেন নি, যেমন বাংলা পদ্যের স্বভাব তিনি সংস্কৃত ছন্দের সমজাতি ভেবেছেন। কিন্তু মোটামুটি তিনি মূল সূত্রটি ঠিকই ব্যাখ্যা করেছেন: বাংলা সাহিত্যের এবং সংস্কৃতির প্রথম বিকাশ লৌকিক জীবনযাত্রায় এবং ঐতিহাসিক তাৎকাল্যবশত ধর্মবাদে—সহজিয়া, নাথ, মনসা, চণ্ডী, ধর্ম ইত্যাদি পন্থায়। ছোট ক্ষেত্রে আরো লোকপুরাণের উদ্ভব হয়েছে, যেমন দক্ষিণ রায়, সত্যপীর ইত্যাদি।

They were the main power behind the resurgence of Hinduism in the 16th, 17th and 18th centuries, and they provided the subject matter of the bulk of Bengali literature in the Gaur and Nadiya periods. They were non-aryan, anti-brahminic, opposed to the caste system, and mainly prevalent among the lower sections of the population. They were called *laukik* or vulgar…'

বলা বাহুল্য এখানে লৌকিক-বিদ্বেষ শুধু ব্রাহ্মণেই সীমাবদ্ধ নয়, চাঁদ সদাগর বা ধনপতি বিত্তবান বণিক সমাজের মানুষ। অথচ এই লৌকিক সংস্কৃতির প্রসার ক্রমেই জাতিব্যাপী হয়ে দাঁড়াল। চৈতন্যভাগবতে তাই জানা যায় যে মনসা বা চণ্ডী পূজারীর রোজগার শুদ্ধতর ব্রাহ্মণের চেয়ে বেশিই হত। এ ব্যাপারেও পরিগ্রহণ ও রূপান্তর লক্ষণীয়, চাঁদ ধনপতিদের বংশধররাই অচ্ছুৎ দেব-দেবীর পৃষ্ঠপোষক, মনসা কৌলীন্য পেয়ে গেলেন শিবের মেয়ে হয়ে, চণ্ডী হলেন শিবানী।

এ যুগের সংস্কৃতি মুখ্যত লোকসংস্কৃতি, যার উত্থান জনসাধারণের মধ্যে থেকে খানিকটা অসহায় বিশ্বাস কিন্তু খানিকটা প্রতিবাদেরই রূপায়ণে। মুসলিম যুগে এ লোকসংস্কৃতি শক্তি পেয়েছিল কারণ এটা সাধারণ হিন্দু ও মুসলিম জনগণের জীবনের মধ্যে একাকার ছিল এবং ভাষাও একই ছিল কি হিন্দু কি মুসলিম সাধারণ মানুষের। জ্যোতিষবাবুর ভাষায়—

'The difference which different religions impose on *human beings vanish before the deep realities of commu-*

nal life, and the lower sections of humanity have a natural tendency towards unity and uniformity. Until the disruption of Bengal's village life in British times, the basic unity of her Hindu and Muslim population was never disturbed. The unity arose out of racial oneness, common economic interest, and the communal life of the village.'

পঞ্চদশ শতকের শেষের জাগরণকে তাই ব্রহ্মণ্যের বা প্রতাপ প্রতিপত্তির জয় ভাবলে ভুল হবে। এই রেনেসান্স ব্রাহ্মণ-ঐতিহ্যে স্থান অর্জন এবং সংস্কৃতবিদ্যার প্রবর্তন করল, কিন্তু তাই বলে ভুললে চলবে না যে এই রেনেসান্সের চালনাশক্তি এল তলার থেকে, লৌকিক সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠায়। এরই ভিত্তিতে বাংলার অনেকগুলি গণআন্দোলনের স্বরূপ বোঝা যায়, বৈষ্ণব আন্দোলন তারই মধ্যে বড় একটি।

জ্যোতিষবাবুর ভাষায় দেশজ জনগণসম্ভূত এই ধারাই হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের প্রাণ, যদিচ তাঁর দৈহিক প্রয়োজন মিটেছে বার বার সংস্কৃত খাদ্যে। তারপরে উনিশ শতকে এল যুগান্তর বিপর্যয়, এল ইংরেজি প্রভাবের মধ্যবিত্ত জাতকের প্রচণ্ড কিন্তু সীমাবদ্ধ জাগরণ। আমাদের পিতামহেরা বললেন, ফিরে চলো সংস্কৃতে, ব্রহ্মণ্যের কালোত্তর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন উপনিষদে আর এগিয়ে চলো কালকের ইওরোপে। প্রাণ না হোক, ডাক্তারী খাদ্য মিলল কিছু, ঐতিহ্য হয়ে গেল খাপছাড়া, মধ্যপদলোপী, অথচ, জ্যোতিষবাবুর ভাষায়, যে য়ুরোপ এল সে এদিকে তৃতীয় শ্রেণীর বাজে মাল আর আবার অতিখর্বকায়, মুখ্যত শুধু উনিশশতকী এবং তাও ইংলণ্ডাবদ্ধ। জ্যোতিষবাবু বলেছেন—

'Saratchandra Chattopadhay and his followers have imported them ready-made from third-rate European novels and our present school of pseudo-realistic fiction is a glaring instance of the bastard culture that is an offspring of the meeting of the East and the West.'

অবশ্য জ্যোতিষবাবু এই দোটানায় সর্বদা তাঁর প্রশংসনীয় দৃষ্টিস্থিরতা রক্ষা করতে পারেন নি। হয়তো সংস্কৃত বা ইংরেজি পদ্যছন্দ কানে আছে বলেই বাংলা পয়ার বা ত্রিপদী তাঁর সমধিক একঘেয়ে লেগেছে। আটাশ পৃষ্ঠায় তিনি ঠিকই ধরেছেন যে পূর্ব উনিশ-শতকী বাংলা কাব্য সংগীতধর্মী তাই তার

বিচারমান শুদ্ধ কাব্য বিচারের মান হলে দুর্বোধ্য হবে, কিন্তু তিনি কথ্য ভাষার ঝোঁক ও সম অসম মাত্রার কথাটা মনে রাখেন নি। সেইজন্যই তিনি, লৌকিক বাংলার ঐতিহ্যের আকর্ষণেই বোধ হয়, মাইকেলের বিষয়ে অবিচার করেছেন। কারণ মাইকেলের শব্দচয়নে অনভ্যস্তের হাতড়ানি যদিও থাকে, তাঁর ছন্দের নিহিত স্বভাব হচ্ছে দেশজ বাংলারই চালে, কথ্যরীতির বিন্যাসের ছন্দের গতিতেই। অথচ জ্যোতিষবাবুর মতো সংবেদ্য কান পণ্ডিত সমাজে বিরল। বিদ্যাসাগরের কীর্তিবিচারে জ্যোতিষবাবু তার চমৎকার প্রমাণ দিয়েছেন: বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্যেই প্রথম বাংলা গদ্যছন্দের বিন্যাস এল।

কবিকঙ্কণের জীবনধর্মী সরস বস্তুআস্তিকতা বা ভারতচন্দ্রের বৈদগ্ধ্য বিষয়ে জ্যোতিষবাবুর আলোচনা উপাদেয় কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার প্রথাসিদ্ধ আতিশয্যের প্রতিক্রিয়ার তিনি মৃত অভ্যাসিক পরোক্ষতা ব'লে যে উদাহরণটি দিয়েছেন, সেটি নেহাত তাঁর বিরূপতারই ভ্রান্তিবিলাস: প্রতি অঙ্গলাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর। সে যা হোক, জ্যোতিষবাবু এই গ্রন্থে বাংলার দু-ধারার দোটানায় পড়ে সম্পূর্ণভাবে সমগ্র ছবি দিতে না পারলেও, সততাসম্পন্ন জিজ্ঞাসু তাঁর গ্রন্থপাঠে প্রশ্নের সব উত্তর না পান, কিছুটা পাবেন, এবং অন্তত প্রশ্নের দেখা পাবেন। এবং আশা করা যায় দ্বিতীয় সংস্করণে এই অসমতা তিনি দূর করবেন। আপাতত তিনি যে আরম্ভ থেকে উনিশ শতক অবধি বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে উনিশ শতকের বাংলার বিচ্ছেদের লক্ষণ ধরেছেন ও বলেছেন তাই আমাদের উপকার। তাঁর টিপ্পনীর সারগর্ভতা বাংলা সংস্কৃতির অনুরাগী, বাঙালী মাত্রেই বোঝে:

'Bengali literature had a prevailing rustic character before the 19th century, it has since acquired a prevailing petty-bourgeois character.'

তার কারণ অবশ্য সাহিত্যে ছাড়িয়ে, বাংলায় ইংরেজি শাসনের বুর্জোয়াসির অপূর্ণতায়। এবং যে কারণে আমাদের উপরতলা মূলত পেতিবুর্জোয়া, সেই কারণেই আমাদের মজুরেরা এখনও বস্তুত, নিদেন মানসে, গ্রামীণ। এই কারণেই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমরা পেয়েছি মূলত 'ম্যাস-প্রোডিউস্‌ড্‌ ব্রিটিশ গুড্‌স্‌'।

দীনবন্ধু মিত্রের নাটকাবলী জ্যোতিষবাবু অনবধানতাবশত প্রায় বিচারেই আনেন নি। কিন্তু বঙ্কিমের বিস্তৃত আলোচনা প্রচুর চিন্তার খোরাক জোগায়।

তাঁর মতে বঙ্কিমের মূল্য বাংলা উপন্যাসের ঐতিহাসিক কারণে, তিনি একজন পুরোধা। কিন্তু সাহিত্যিক বিচারে বঙ্কিম নেহাতই সামান্য ঔপন্যাসিক। জ্যোতিষবাবু বঙ্কিমের আটটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বিচারে এই সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হয়েছেন যে তার একটিও ঐতিহাসিক পদবাচ্য নয় ; আনন্দমঠ, সীতারাম, রাজসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসের বিশ্লেষণে তাই প্রমাণ হয়। সামাজিক উপন্যাসকার হিসেবে বঙ্কিমের সহানুভূতি অগভীর ও অপরিসর দুইই। বঙ্কিমের মধ্যে জ্যোতিষবাবুর মতে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসাও নেই, অথচ একটা ব্যাপক মানবিকতাও নেই। তাঁর অধিকাংশ পুরুষচরিত্র পেস্টবোর্ডে এবং তাঁর মেয়েরা আরম্ভে প্রাণবান হলেও শেষটা একটা বেসুরে মিলিয়ে যায়। কারণ বঙ্কিমের পুরুষার্থ তৎকালীন ও তৎশ্রেণীর গয়ংগচ্ছ স্রোতে চলামাত্র। জ্যোতিষবাবু দীর্ঘ বিশ্লেষণের পরে বলেছেন যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সজাগ মানুষের যুগে বঙ্কিমের এই অভ্যাসিকতা তাঁর নিজেরই দুর্বলতা। জ্যোতিষবাবুকে বঙ্কিম-বিরোধী ভাবলে ভুল করা হবে, তিনি ইন্দিরার প্রশংসায় ন্যায্যতই পঞ্চমুখ। কিন্তু বঙ্কিমের রাজসমাজতান্ত্রিক উপন্যাসের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তিগুলি নগণ্য নয়। অবশ্য জ্যোতিষবাবু স্বীকার করেন যে বঙ্কিমের ইংরেজ আনীত সংস্কৃতি সম্ভাষণে কিছুটা সত্য আছে যদিচ

'The view is too idealistic and ignores the economic and political aspect of British rule.'

তাছাড়া এ একচক্ষু মত বঙ্কিমের একার নয় :

'It runs through the synthesis between the East and the West made by Indian thinkers from Rammohan Roy to Rabindranath Tagore. We should also note that except in the work of a small number of intellectuals, the best elements of European literature cannot be said to have arrived in Bengal or, having arrived, to have struck roots.'

তাই জ্যোতিষবাবুর মতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত

'imported from the West the sentimental languors of the Celtic Twilight, the affections of the fin de siecle aestheticism, and the misty vagueness of Maeterlinckian symbolism.'

কিন্তু জ্যোতিষবাবু তাঁর শেষ অধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ অধ্যায়ে একটু হতাশই

করেছেন। প্রথমত তাঁর শেষ পাতার উদ্ধৃতিটি : জানি গো জানি দিন যাবে : *গানটি কবির শেষ দিকের রচনা বলেছেন নেহাত অসতর্কতায়। দ্বিতীয়ত তিনি গোরা, চতুরঙ্গ প্রভৃতি উপন্যাসগুলির বিচারই করেন নি।* অথচ গোরা, বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসই নয়, বাংলা জীবনের ও সংস্কৃতির দু-ধারার ব্যর্থ সমন্বয় চেষ্টায় আমাদের জাতীয় রূপকও বটে ; তারপরে জীবন এগিয়েছে, ইতিহাস ও তার জ্ঞান এগিয়েছে কিন্তু এখনও গোরার স্থান নেবার ঐতিহাসিক উপন্যাস হয় নি। এই দিক থেকে অবাক লাগে যখন কোনো সমালোচক গোরার সঙ্গে এবং গোরার চেয়েও সার্থক হিসেবে শেষের কবিতার সামাজিক রূপকান্বয় দেন, যদিও সাহিত্যবিষয়ে সচেষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই জানে যে শেষের কবিতা প্রতিভার খেলা মাত্র।

জ্যোতিষবাবু গীতিনাট্য প্রসঙ্গেও অসম্পূর্ণ। মায়ার খেলা ও বাল্মীকি-প্রতিভার নাম করে তিনি ক্ষান্ত অথচ তিনি কি জানেন না যে বিশ্বের শিল্পে চণ্ডালিকা ও চিত্রাঙ্গদা অপূর্ব সৃষ্টি ? অধিকন্তু রবীন্দ্রনাথের আপাতলঘু ক্ষণিকা এবং শেষ কবিতার নগ্নকঠিন বইগুলি যদি তিনি উল্লেখ এবং তাদের যন্ত্রণা ও জিজ্ঞাসা বিচার করতেন, তাহলে তাঁর রবীন্দ্রনাথের অন্যথা গভীর বিশ্লেষণ সার্থক হত। তাহলেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত তার প্রকৃত ব্যাখ্যা ও নির্দেশ পেত ;

'The lack of any deepseated conflict in his nature, while it gave him spontaneity and saved him from morbid introspection and self-analysis, was also responsible for many a facile sentiment and gilded platitude.'

শেষে শুধু একটা কথা বলা দরকার। ইংরেজি পাঠকের পক্ষে তথা অধিকাংশ বাঙালী পাঠকের পক্ষেও প্রত্যক্ষ বাংলাসাহিত্যের ক্রিয়াকাণ্ড স্পষ্ট হত যদি জ্যোতিষবাবু যাত্রা, কথকতা, কবিগান, কীর্তন, গাজন ইত্যাদির একটু বর্ণনামূলক উল্লেখ করতেন। যেমন স্পষ্ট হত তাঁর মূল তত্ত্ব : বাংলা সাহিত্যের মুখ্য লৌকিক ধারার শক্তির কথা, যদি তিনি রবীন্দ্রনাথের ছেলেভুলানো ছড়া এবং অবনীন্দ্রনাথের বাংলার ব্রত-র পথে লৌকিক মানসের এ দিকটার সন্ধান নিতেন ও দিতেন। রূপকথার উল্লেখ অবশ্য তিনি করেছেন। কিন্তু সে বিষয়েও হয়তো আরো বিস্তৃত আলোচনা পেলে ভালো হত, কারণ আজও দেখা যায় কোনো কোনো সমালোচক পথনির্দেশের সংক্ষিপ্ত উৎসাহে উনিশ-শতকসর্বস্ব আবেগে লোকসাহিত্যের ধারায় ও নির্মাণে রূপকথার ব্যঞ্জনা জন-বৈরিতা ভাবেন।

৫

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

গত শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত বাঙালী আমরা পরম উৎসাহে নতুন শিক্ষায় মেতেছিলুম, তখন সে উৎসাহ ছিল স্বাভাবিক, একমাত্র সোজা পথ। সমাজ-ব্যবস্থায় মোড় ফেরার সময় তখন, নতুন শিক্ষায় ছিল জীবিকার ভরসা এবং নতুন জীবনযাত্রার আশা। সে আশাভরসার চেহারা আজকে স্পষ্ট হয়েছে অনেক নৈরাশ্যের সংঘর্ষে। তার কারণ অবশ্য পূর্বজদের চেয়ে আমাদের বুদ্ধির আধিক্য নয়। সাহিত্যশিল্পের জগতে বিশেষ করে আমাদের ঐতিহাসিক বিনয় প্রয়োজন। কারণ সে জগতে কি গ্রাহ্য আর কি ত্যাজ্য, সে বিষয়ে সেকালের কবিরা আমাদের দৃষ্টান্ত হয়ে অনেক পণ্ডশ্রম থেকে বাঁচাতে পারেন।

তাই আজকে আমাদের উত্তরাধিকার আবিষ্কার করতে হলে যাঁদের রচনাবলী বিচার করতে হবে, তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিশেষ মর্যাদা। সে আবিষ্কারে বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের সহায়। গুপ্তকবির প্রতিভা বঙ্কিম প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং বঙ্কিমের মধ্যেও সেই দেশজ মনোবৃত্তির কিছু আভাস পাওয়া যায়, যে মনোবৃত্তি শিক্ষিত বাঙালী আর বাংলার জনসমাজের বিলীয়মান ভেদের সমাধানে আমাদের অবশ্য আলোচ্য। বঙ্কিমের ভাষায় 'মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙালীর কবি, ঈশ্বর গুপ্ত বাংলার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙালী কবি জন্মে না, জন্মিবার জে নাই, জন্মিয়া কাজ নাই।' কথাটি ঐতিহাসিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ, কিন্তু ইতিমধ্যে শিক্ষিত বাঙালী আর খাঁটি বাঙালী, দুই স্রোত অনেক দূর বয়ে গিয়েছে, দুর্লঙ্ঘ্য ভেদের ব্যবধানে দুই স্রোতই সমুদ্রে গিয়ে আজ একাকার। আজ আমরা শিক্ষিত শ্রেণীর বিড়ম্বিত কাব্য সাধনার চূড়ান্তে এসেছি। আমাদের সংস্কৃতির ক্ষুরধার চূড়ায় সামাজিক সমর্থনের আশ্রয় নেই অথচ সমাজ-জীবনের মরিয়া তাগিদে আমাদের ব্যক্তিত্ববাদের দোরগোড়ায় হানা দিচ্ছে। আজকে তাই কবিকুলকে ভাবতে হচ্ছে বাংলার জনসমাজের চৈতন্যের সঙ্গে, দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে সেতুবন্ধনের কথা। অবশ্যই এ একতা

পারম্পারিক। এবং যেহেতু ব্যাপারটা যান্ত্রিক নয়, সেই হেতু এই সংগঠন সাহিত্যিক বক্তৃতায় বা বই পড়ে বা লিখেই হবে না। কিন্তু এলোমেলো সামাজিক সত্তার প্রাণপ্রতিষ্ঠায় সাহিত্যেরও গৌণ দান আছে এবং দেশজ ঐতিহ্যের সন্ধান আজকে তার প্রথম পর্ব।

এই ঐতিহ্য আমরা আজও লোকশিল্পে ও সাহিত্যে খুঁজে পাই। বঙ্কিম একে বলেছিলেন রিয়ালিজম। পাহাড়পুরের শিল্পনিদর্শন থেকে গ্রামশিল্পের যেসব লুপ্তপ্রায় নমুনা মেলায় আজও দেখা যায়, সেসবেই এই বহির্জগতের বস্তু সম্বন্ধে সুস্থ মনোযোগের প্রমাণ। চণ্ডীকাব্যে, মঙ্গলকাব্যে, এমন-কি বৈষ্ণব পদাবলীতেও এই স্বাস্থ্য আমাদের আশ্চর্য করে। এই মনোবৃত্তি দেবদেবীর প্রতি মানুষের মহিমা আরোপ করে, সদাগরদের নাকাল করে, প্রেমের মধ্যে নিঃসংকোচ সম্পূর্ণতা পায়। ইংরেজিতে একেই তো মানবিকতা বলে। এই মানবিকতার বস্তুনির্ভরতা, বুদ্ধির উপরে আস্থা, ভাববিলাস এড়িয়ে অভীপ্সা ও প্রত্যক্ষের সমন্বয়—হয়তো বা একটু রসিকতার আমেজেই সমন্বয়—আজও বাংলা জনসমাজের অন্তরঙ্গ জীবনে দেখা। শিক্ষিত বাঙালী সান্নিধ্যে আমরা ভুলে যাই যে বাঙালীর বিখ্যাত ভাবালুতা সাম্প্রতিক এবং শিক্ষিত বাঙালীর বিশেষত্ব মাত্র। দেশের যে ঐতিহ্য ব্রিটিশপূর্ব শিল্পসাহিত্যের উৎস, সেই লোকমানসে বাচালতা থাকলেও অশ্রুজলের চর্চা নেই।

গত শতাব্দীর কণ্টকিত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই ঐতিহ্য রক্ষায় এক দিক্‌পাল। সেখানে তাঁর কাজ শুধু উপভোগ্য লেখা নয়, তাঁর সাহিত্য-জীবন রূপকও বটে। পুরাতন ঐতিহ্যে বাঁধা তাঁর লেখনী নতুন সমাজের পটে যে আঁচড় কেটেছিল, সেটাই বিস্ময়কর ঘটনা। হয়তো সে আঁচড়ে মহাকাব্যের রূপ নেই, কিন্তু কবির লড়াই-এর কবি, প্রথাসিদ্ধ খাদ্যবর্ণনার কবি, প্রণয় বা পরমার্থের লেখক যে সংবাদপ্রভাকরের চক্ষুষ্মান সম্পাদক ছিলেন এ তথ্য আমাদের কাছে মূল্যবান।

প্রভাকর প্রভাতে, প্রভাতে মনোলোভা।
দেখিতে সুন্দর অতি, জগতের শোভা ॥
আকাশের অকস্মাৎ আর এক ভাব।
হয় দৃষ্ট নব সৃষ্ট সুখদ স্বভাব ॥

ইত্যাদির প্রথাসিদ্ধ লেখকই দুর্ভিক্ষ, নীলকর, শিখযুদ্ধ, বর্মাযুদ্ধ বিষয়ে অল্পবিস্তর জোরালো পদ্য লিখেছিলেন।

ঈশ্বর গুপ্তের ইংরেজি নববর্ষ নামক কবিতা থেকেই এই দ্বৈতধর্মী বস্তুবাদের মজাদার উদাহরণ আরম্ভ করি।

খৃষ্টমতে নববর্ষ অতি মনোহর।
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ যত শ্বেত নর॥

সে উৎসবে :

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছোটে।
আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ্ ফোটে॥

পরে দেখি :

বিবিজান চলে যান লবেজান করে।
শাড়ীপরা এলোচুল আমাদের মেম।
বেলাক নেটিভ লেডি শেম্ শেম্ শেম্॥
সিন্দুরের বিন্দু সহ কপালেতে উল্কি।
নসী, যশী, ক্ষেমী, রামী, যামী, শামী, গুল্কি॥

এদিকে কিন্তু এ বহিরাশ্রয়ীর চোখে ছদ্ম মিশনরীও কবিতার বিষয়, পৌষ পার্বণেও কবির প্রবল আগ্রহ। তপসীমাছ বা পাঁঠা কিছুতেই এ বস্তুবাদীর আপত্তি নেই—

রসভরা রসময় রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল॥
তুমি যার পেটে যাও সেই পুণ্যবান্।
তুমি সাধু সাধু তুমি ছাগীর সন্তান॥

কিংবা :

কষিত কনককান্তি কমণীয় কায়।
গালভরা গোঁফ দাড়ি তপস্বীর প্রায়॥
হায় রে তপস্বী, তোর তপস্যার কি জোর॥

আনারসকে তাই মনে হয়—

বন হতে এল এক টিয়ে মনোহর।
সোনার টোপর শোভে মাথার উপর॥
ঈষৎ শ্যামল রূপ চক্ষু সব গায়।
নীলকান্ত মণিহার চাঁদের গলায়॥

সকল নয়ন-মাঝে রক্ত আভা আছে।
বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে॥

শেষে :

অন্তে যেন এই হয় আমার কপালে।
গালে এসে বাস করো মরণের কালে॥

এই প্রকৃত মনের বাস্তবিকতাতেই কবির সহানুভূতি রূপ পায় :

কিছুদিন মা! দয়া করি রপ্তানিটি বন্ধ রাখো,
ধনে প্রাণে হল কাঙালী
ভাত বিনে বাঁচিনে, আমরা ভেতো বাঙালী,
চাল দিয়ে মা বাঁচাও প্রাণে চালের জাহাজ চেলো নাকো॥

কিংবা :

হয় দুনিয়া ওলটপালট আর কিসে ভাই রক্ষে হবে।
পোড়া আকালেতে নাকাল করে, ডামাডোল পড়েছে ভবে।
আমরা হাটের নেড়া শিক্ষে ধরে ভিক্ষে করে বেড়াই সবে।

সেকেলে কবির তাই ভরসা দূর সিংহাসনে :

ওগো মা ভিক্টোরিয়া,
কর গো মানা; যত তোর রাঙা ছেলে আর যেন মা
চোখ রাঙে না চোখ রাঙে না॥—

কিন্তু এ হিন্দুসভামন্য কাতর প্রার্থনাতেও অতিকথনের চটক, চাপা হাসির আভাস :

ও-মা! গো-হত্যাটি উঠিয়ে দে মা! অভয়পদে এই বাসনা :
মাগো, সকল গরু ফুরিয়ে গেলে দুগ্ধ খেতে আর পাব না॥

ওদিকে :

এই ভারত কিসে রক্ষা হবে ভেব না মা, সে ভাবনা।
সে "তাঁতিয়া তোপির" মাথা কেটে আমরা ধরে দেব "নানা"॥

অবশ্য এ কথা মানতে হবে সে সমস্যাই শুধু ঈশ্বর গুপ্তকে উত্তেজিত করে, সেইটুকুই তাঁর কৃতিত্ব। তিনি মুখ ফিরিয়ে কাব্য সাধনা করেন নি এইটাই বড় কথা। সমাধান যেকালে ইতিহাসেই প্রায় দৃশ্য ছিল না, সেকালে একজন কবির মধ্যে সে দিব্যদৃষ্টি আশা করাই অন্যায়। তাই গুপ্ত-কবি তিক্ত দ্বিধায় সীমাবদ্ধ। ভিক্টোরিয়া-র ভক্ত তাই মার্শম্যানকে বিদায় দেন :

শুনিতেছি বাবাজান এই তব পণ।
সাক্ষ্য দিতে করিতেছ বিলাতে গমন॥
জোড়করে পশুপতি করি নিবেদন।
সেখানে কোরো না গিয়ে প্রজার পীড়ন॥
ভূত প্রেত সঙ্গীগুলি সঙ্গে লয়ে যাও।
এখানে বসিয়া কেন মাথা আর খাও?
বাজাই বিজয়ী বাদ্য টম্ টম্ টম্
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙে বম্ বম্ বম্।

বিধবা-বিবাহ ঈশ্বর গুপ্তের পছন্দ হয় না, অথচ বিলাত থেকে সে আইন প্রত্যাহারের সম্ভাবনাও তাঁকে বিচলিত করে। এদিকে তিনি লেখেন:

কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব।
দেখে শুনে মুখে আর নাহি সরে রব।
একদিকে কোশাকুশী আয়োজন নানা।
আর দিকে টেবিলে ডেভিল খায় খানা।
পিতা দেয় গলে সূত্র, পুত্র দেয় কেটে।
বাপ পূজে ভগবতী, বেটা দেয় পেটে।
বৃদ্ধ ধরে পশুভাব, জন্তুভাব শিশু।
বুড়া বলে রাধাকৃষ্ণ, ছেলে বলে যিশু॥

ওদিকে ভাবী সমাজের চিত্রও তাঁকে সান্ত্বনা দেয় না:

লক্ষ্মী মেয়ে যারা ছিল,
তারাই এখন চড়বে ঘোড়া।
ঠাটঠমকে চালাক চতুর
সভ্য হবে থোড়া থোড়া।
আর কি এরা এমন করে
সাঁজ সেঁজুতির ব্রত নেবে?
আর কি এরা আদর করে
পিঁড়ি পেতে অন্ন দেবে?
পর্দা তুলে ঘোমটা খুলে
সেজে গুজে সভায় যাবে।

আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী
গড়ের মাঠের হাওয়া খাবে।

আমরা কবিত্ব বলতে যা বুঝি, রোমান্টিক কাব্যের সে সংজ্ঞা গুপ্তকাব্যে প্রযোজ্য না হলেও তার নিজস্ব মর্যাদা আছে। অনেকেরই ধারণা যে এ মেজাজ বা মননরীতিতে মহৎ কাব্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। কিন্তু সামাজিক পরিবেশে এ প্রাকৃত মনোবৃত্তিও যে রোমান্টিক আবেগে দানা- বাঁধতে পারে, তার প্রমাণ ইংরেজি কাব্যে চসর এবং আরো মহৎ প্রমাণ দান্তে। রোমান্টিক কাব্যধারায় যেটা মস্ত লাভের বিষয়, সেটা হচ্ছে কাব্যরূপ বা ফর্ম সম্বন্ধে সচেতনতা। ঈশ্বর গুপ্ত সে জ্ঞানের দিকে মনোযোগ দিতে পারেন নি, তার জন্যে অনেকটা দায়ী হয়তো তাঁর শৈশবের প্রতিকূল আবহাওয়া, শিক্ষার অভাব।

তাছাড়া, মনে রাখা দরকার যে তিনি যুগসন্ধির, সামাজিক দোটানার, শিক্ষার ও ঐতিহ্যের আপাতবিরোধের কবি, সে বিরোধে তিনি ঐতিহ্যের চেনা পক্ষই নিয়েছিলেন। দেশজ রীতি বা কনভেন্‌শনেই তাঁর কবিত্বের শক্তি এবং সে কনভেন্‌শনের সামাজিক কাঠামোতে তখন ভাঙন ধরেছে, আর সে রীতির লৌকিক স্বভাব এবং রোমান্টিক জ্ঞান-গরিমার সমন্বয় তাঁর আয়ত্তে ছিল না। তার কারণ যে শুধু তাঁর কবি-প্রতিভার সামান্যতা নয়, তার প্রমাণ পাই মাইকেল, হেমচন্দ্র একাধিক নামকরা কবিকীর্তিতে।

হেমচন্দ্র অবশ্য প্রায় ঈশ্বর গুপ্তের সমগোত্র ছিলেন কবিত্বের তুলাদণ্ডে। হেমচন্দ্র এদিকে রোমান্টিক স্বপ্নের অভীপ্সার আস্বাদে মাইকেলের অনুকারক, ওদিকে আবার গুপ্ত-কবির রীতিতে সাময়িক ঘটনা নিয়েই পদ্য লেখেন। কিন্তু দুটি ধারা তাঁর কবিস্বভাবে এক হয় না। ফলে দুটি ধারাই তির্যগ্‌গামী, ক্ষীণ। মাইকেলের প্রচণ্ড প্রতিভা এ-সমন্বয় প্রায় সম্ভব করে তুলেছিল। মেঘনাদবধের উদ্দাম কল্পনা চতুর্দশপদাবলীতে, ব্রজাঙ্গনায় অনেকটা সমাজবেদ্য, অনেকটা প্রাকৃত সমর্থনে সার্থক। তবু তাঁর কাব্যভাষার বাধা মাইকেল বাঁধতে পারেন নি। তাই বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ বা একেই কি বলে সভ্যতায় যে প্রাকৃত শুভবুদ্ধির সামাজিক দৃষ্টি, যে বস্তুনির্ভর দেশজরীতির সুস্থ মনোবিন্যাস পাই, তা তাঁর মিলটন-ঘেঁষা বায়রন-ঘেঁষা কাব্যে মূর্তি পায় নি। কবিতার চেয়ে নাট্যরূপ কেন এ কাজে সহায় সে কথা এ প্রসঙ্গে বিচার্য। এই শুভবুদ্ধি, এই রীতি টেকচাঁদকে কালীপ্রসন্নকে লুব্ধ করেছিল, দীনবন্ধু মিত্র এই মননের উৎসেই পান তাঁর অসামান্য শেক্‌সপিয়রীয় মানবিকতা। ঐতিহাসিক কারণে ও ব্যক্তি-

গত দুর্ভাগ্যে ঈশ্বর গুপ্ত এই রীতির সার্থকতা ও সীমাবদ্ধতা একাধারে দুয়েরই দৃষ্টান্ত। কিন্তু বাক্যবিন্যাসের দেশজ রীতি আজও আমরা ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে খুঁজতে পারি, যেমন পারি বস্তুনির্ভর সাধারণ সুস্থ বুদ্ধির সরসতা। অবশ্য কোনো-কোনো সাহিত্যিক গোষ্ঠীর দেশী সাধনায় এই সন্ধানের মধ্যে একটা স্থূলতা দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরেও রুচির এই বিপরীত রূপ আমাদের মধ্যবিত্ত বিড়ম্বনাতেই সম্ভব। তার জন্যে চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত বাংলা ঐতিহ্যের কবিরা দায়ী নন, দায়ী আমাদেরই ঐতিহাসিক বোধের অভাব এবং মধ্যবিত্ত কুরুচি।

৫

সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

আমাদের সভ্যতার ইতিহাসে দেশ ও কাল, টাইম ও স্পেস্ কি করে মানুষের মনে প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে, তার বিবরণ আজকাল পণ্ডিত ব্যক্তিরা দিচ্ছেন। বহির্জগতের সম্বন্ধসংঘাতে এই সব প্রত্যয় জাগে আমাদের মনে। সভ্যতাব আর-একটি বড় প্রত্যয় হচ্ছে ব্যক্তিত্ববোধ। কি করে সমাজ ও ব্যক্তিতে দ্বন্দ্বাশ্রয়ী সম্বন্ধের দীর্ঘ ইতিহাসে এই ব্যক্তির স্বরূপ মর্যাদা পেতে লাগল, তার ব্যাখ্যা সভ্যতারই ইতিহাস। বহির্জগতের বিরুদ্ধশক্তি, অন্ধপ্রকৃতি, জন্তু-জানোয়ার, হিংস্র-গোষ্ঠীর দলাদলি যতদিন না মানুষের শুভবুদ্ধি কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা পেয়েছে, ততদিন ব্যক্তির এই মহিমা কবিদের মনেও আসে নি। বাল্মীকি বা হোমর গোষ্ঠীর রচনাই করেছেন, রবীন্দ্রনাথই বলতে পেরেছেন ব্যক্তির স্বকীয়তার কথা :

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীব এক কোণে রহিব আপন মনে,
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা!
গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
ঘরে আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা,
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।

ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বিষয়ে যে বোধ থেকে এই আশার জন্ম, সে বোধ মানব-সভ্যতার বিশেষ একটা পরিণতিতেই সম্ভব। কিন্তু এখনও সম্ভব নয় এই আশাকে সকলের পক্ষে সফল করা। ব্যক্তির এ স্বাধীনতা কোথায়, যেখানে অর্থের প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিত্বই পণ্যদ্রব্য মাত্র? বাণিজ্যচণ্ডীর তাড়নায় তাই রবীন্দ্রনাথকেও বলতে হয়েছে :

বহুদিন মনে ছিল আশা
অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী,
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিনু আশা!

সকল সচেতন মানুষের মধ্যেই তো অন্তরের ধ্যানখানি আপনার ভাষা খোঁজে। কিন্তু জ.বনযাত্রার অমানুষিক রথচক্রঘর্ঘরে সে ভাষা ডুবে যায়, মন ভবিষ্যতে খুঁজে বেড়ায় তার সম্পূর্ণ বাণী।

ভবিষ্যতের কথা বলতে গেলে আমার মনে পড়ে ইংরেজি কবি এলিঅটের ধরতাই বুলি : অতীত ও ভবিষ্যৎ দুয়ের অঙ্গুলি-নির্দেশ একদিকে— এই বর্তমানে। বর্তমানের উৎসারিত স্বপ্নের সৃষ্টিই তো আমাদের ভবিষ্যতের ছবি— নানা স্বপ্নের ঐকতান, দুঃস্বপ্নেরও। বর্তমান যদি কিছুমাত্র সুস্থ হত, তাহলে হয়তো আমাদের স্বপ্নপ্রয়াণে সামঞ্জস্য থাকত! কিন্তু নানা লোভে ক্রূরতায় আজ আমরা ক্ষতবিক্ষত। স্বেচ্ছাকৃত অভাবে যুদ্ধে প্রতিষেধ্য রোগে, অনাবশ্যক মৃত্যুতে আমাদের স্বপ্নগুলিও ছত্রভঙ্গ। তাই ঐকতান ছিন্নভিন্ন অন্ধকার কলকাতার উচ্চকিত রাস্তায় গলিতে। কিন্তু জীবন তবু হার মানে না, তার শিকড় আমাদের মনের গভীরে, দুর্মর প্রাণ নৈর্ব্যক্তিক আবেগে নির্নিমেষ চোখ মেলে থাকে, উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দেশ, আসন্ন সমাজ কাঁপে চৈতন্যের সম্ভাবনায়, অবশ্যম্ভাবিতায় বীজ কম্প্র নীল অন্ধকারে বর্শার ফলার মতো, পাহাড়ের চূড়ার মতন। বিসংবাদের মধ্যেই উজ্জীবনের সমাধান হেঁকে যায়, উদয়াচলে মেশে অস্তাচলের রক্তস্রোত, ভগ্নদূতের মুখে জাগে মিছিলের প্রবল আশা, প্রাণের কবি অতীতের সিঁড়ি ভাঙে আর গায় ভাবীকালের ভাষা!

ব্যাপারটা নিছক কবিত্ব নয়। ইতিহাসের সাক্ষ্য এর পক্ষে। বিজ্ঞান এর সমর্থক। আর বিজ্ঞান আজ আমাদের সারা বিশ্বে বাহুবিস্তার করেছে, আজ আর বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে শেষ নয় বা স্বতন্ত্র পেশা বা বিশেষজ্ঞের জ্ঞানে

আবদ্ধ নয়, আজ জীবনে তার ব্যাপ্তি প্রায় জীবনের মতোই গভীর ও জটিল। কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই প্রচণ্ড-ব্যাপ্তির মধ্যে বিশেষ ও নির্বিশেষে একতার বহুধা বন্ধন, বাহির ও ঘরের, দেহ ও মনের, ব্যক্তি ও সমাজের, বস্তু ও রূপের হরিহর আলিঙ্গন।

আর বিজ্ঞান বলতে এই ছবিই তো আমাদের মনে জাগে। ভবিষ্যতের স্বপ্নে এই বিজ্ঞানই, আধুনিক বিজ্ঞানই জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আজ যেখানে মানুষ লোভে পড়ে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে না— পাছে মুনাফার হার কমে যায়, সেখানে বিজ্ঞানকে দূরে পরিহার করার ইচ্ছাটা আমার মতো লেখকশ্রেণীর অসহায় জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু অর্থনীতির স্তরকে ছাড়িয়ে যখন আমরা মানুষের স্তরে পৌঁছতে চাইছি, তখন এ আশা অমূলক নয় যে জীববিদ্যায় মনোবিদ্যায় নির্মাণকার্য আরম্ভ হবে মানুষকে নিয়ে। জীবিকা বা জীবনযাত্রার শূলে চড়ানো আজকের মানুষ নয়, স্বাধীন জীবনের পটভূমিতে নিছক মানুষ। অর্থাৎ দুজন মানুষের মধ্যে প্রভেদটা কেন হবে অর্থনীতিগত কারণে, তাদের জীবনযাত্রার আবশ্যিক প্রভেদের জন্যে! কেন হবে না দুজন মানুষের শারীরিক মানসিক ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাসের জন্যে, নিছক মানসিক কারণে? অবশ্য সাহিত্যের আসল কারবার চিরকালই চলেছে মানুষকে নিয়ে, ব্যক্তিস্বরূপ বা পার্সন্যালিটিকে নিয়েই।— কিন্তু সে মানুষ প্রায়ই হয়েছে তার জীবনযাত্রার দাসানুদাস, ব্যক্তিস্বরূপ বিড়ম্বিত হয়েছে বহিঃসমাজের চাপে, আকস্মিকতায়।

ধরা যাক প্রেমঘটিত ঈর্ষ্যার কথা। ওথেলো নাটকের পরস্পরে বিশ্বাস বা আস্থা ঘটিত মুখ্য ভাব-বস্তু সম্ভবত চিরকাল নরনারীর সম্বন্ধে যন্ত্রণার উৎক্ষেপ আনবে, কিন্তু ঈর্ষ্যার যে বিশেষ চেহারা ঐ নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে ও তাদের কর্মধারার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, তা হয়তো পরিবর্তনশীল। ভিন্ন সামাজিক পরিবেশ ওথেলোর মুরিশ্ মত্ততা, ইয়াগোর কুটিল স্বার্থপরতা, ডেসডিমনার অসহায়-অবলা ধরন-ইত্যাদি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ নিতে পারে ব্যক্তিত্বের ভিন্ন প্রতিষ্ঠায়। মধ্যযুগের দিকে তাকালেই আমরা এই ভিন্ন রূপের একটা আভাস পাই, দান্তের-মুখে পাওলো ও ফ্রানচেসকার অবৈধ প্রেমের যে ভাষ্য, সে পুরুষার্থ মধ্যযুগের ধর্মের ছকে ফেলা সামাজিক জীবনেই শোভন। কিংবা ক্রবাদুর কবি প্যের ভিদাল্‌কেই ধরি, বৈষ্ণব কবির মতো ক্রবাদুর রীতিতে পরকীয়াকে উপলক্ষ্য করে প্রেমের কাব্যসাধনা চলিত ছিল, কাউণ্টেস লোবা তাই হেসেই প্যের ভিদালের কবিতা শুনতেন, ভিদালের আজগুবি খেয়ালে

কাউণ্টও কখনো বিচলিত হন নি। এমন-কি ভিদাল্ যখন আবেগে আত্ম-বিস্মৃত হন, এবং লোবা নিজেই কবির বিরুদ্ধে নালিশ জানান, তখনও কাউণ্ট ব্যাপারটা হেসেই ওড়াতে চান, কারণ ক্রুবাদুর রীতিই যে প্যের ভিদালের এই আতিশয্যকে সম্ভব করেছিল। সেই রকম বলা যায় যে বিধবাবিবাহ যদি সত্যই সমাজে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তাহলে কি রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি"র রূপ ভিন্ন হয়ে যাবে না? ছেলেমেয়ের কাছে ভালোবাসার দাবি বৃদ্ধ মা-বাপের মনে বরাবর থাকবে; কিন্তু কিং লিয়ারের ট্রাজেডির মধ্যে কতখানি অংশ জুড়েছে রাজত্বের ভাগবাটোয়ারা? এমন-কি এড্মণ্ডের মধ্যেও তো জারজ সন্তানের গ্লানি এবং পৈতৃক সম্পত্তির লোভটাই সবচেয়ে উগ্র আবেগ।

সাহিত্যের অবশ্য স্বায়ত্তশাসনের দিকে ঝোঁকটা দীর্ঘকালের, তাই এই সব বহির্জাত কারণকে, আকস্মিক সামাজিক হেতুকে সাহিত্যিকরা বরাবরই দাবিয়ে রেখেছেন, মর্যাদা দিয়েছেন মানুষকে, ব্যক্তিকে। তাই আমাদের মনে থাকে না যে গোবিন্দলাল বা রোহিণীকে স্বাধীন মানুষ বলার চেয়ে লোভের পুতুল বলাই সংগত। এই অসংগতি এড়াবার জন্যেই সেকালের সাহিত্যে পৌরাণিক গল্পের মাহাত্ম্য থাকত, না হয় থাকত প্লটের মাহাত্ম্য। প্লটের সম্মোহনে আপাত-স্বাধীন মানুষও জীবনমৃত্যুর কাছে নিজেকে দিত বিকিয়ে। কিন্তু সাহিত্যের নিজস্ব ঐতিহাসিক বিকাশে ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল সাহিত্যের আত্মমর্যাদা। ফলে আধুনিক সাহিত্যে প্লট গৌণ, চরিত্র বা ব্যক্তি ও তার সঙ্গে জড়িত আবহাওয়াই মুখ্য। কিন্তু সমাজ এখনও সেই পুরোনো আর্থিক প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই চলেছে, ফলে এই আধুনিক সাহিত্যের স্বাধীন ব্যক্তিরা এতই স্বাধীন যে তাদের বাহির-রূপ প্রায় নেই বললেই চলে, আছে শুধু তাদের মনের অন্তরঙ্গ স্বাধীনতা।

সে স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায় মনোবিজ্ঞানের অচেতন বা অবচেতনে এবং সে নিরাকার জগতে রামশ্যামকে আলাদা করে চেনা শক্ত। ফলে ব্যক্তিত্বের নির্বিশেষ সন্ধানের শেষ দেখি ব্যক্তিত্বলোপে। কারণ সাহিত্যের উপজীব্য শূন্যে ঝোলানো নিরালম্ব ব্যক্তিত্ব নয়। সে ব্যাপারটা বাস্তবে টেঁকেও না, নিরালম্ব ব্যক্তিত্ব একটা এবস্ট্রাকশন বা পরোক্ষনিদান, এবং সাহিত্যের কাজ প্রত্যক্ষ নিয়ে, বাস্তব নিয়ে। সাহিত্যে চৈতন্যের স্রোত বা স্ট্রীম অব্ কনশাসনেস-এর চর্চায় আমরা শিখেছি অনেক কিছুই, কিন্তু, সে পরীক্ষার আর বিকাশের পথ রুদ্ধ।

বিকাশের পথে ব্যক্তিত্বের নব-নব উন্মেষে নতুন-নতুন বিস্তারে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সে সম্বন্ধ যাতে আকস্মিকতা-না হয়, যাতে মধ্যযুগের বৃত্তিতে সীমাবদ্ধ না হয়, যাতে একালের প্রতিযোগিতা-মূলক জীবনযাত্রায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন না হয়, তার জন্যে চাই বিজ্ঞানশুদ্ধ মনুষ্যধর্ম। যে ধর্মে অর্থকরী বৃত্তির সুযোগ সকলের পক্ষে সমান, অবসর প্রচুর, সংস্কৃতির ক্ষেত্র বিস্তৃত, ধনীদরিদ্রের, উন্নত-অনুন্নত জাতির ভেদ অবান্তর; মৌরসীপাট্টা জীবন-যাত্রা নয়, জীবনই সেখানে মূল্যবান। টাকা সেখানে পুরুষার্থ নয়, প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিস্বরূপ সেখানে চরম মর্যাদা পায়, বিজ্ঞান সেখানে জীবনের সঙ্গে একাকার। সমাজের সেই ভাবী গৌরবের দিনে শিল্প-সাহিত্যেরও পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত।

হেন্‌রি জেমসের উপন্যাসের ভূমিকাগুলিতে আমরা এই স্বাধীনতার অভাব ও জেমসের স্বকীয় সমাধানের চমৎকার ব্যাখ্যা পাই। লেখকের স্বকীয় সুর-বিস্তার কাম্য যে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সমাজের পটভূমিগত জটিলতার ও ভেদাভেদে সে বিস্তার হয় বারংবার বিড়ম্বিত। রূপকথায় যে স্বাধীনতা দেখি সে কল্পনার বা রূপায়ণের মুক্তি হয় ব্যাহত। জেমসের অননুকরণীয় ভাষায়:

'Yet the fairy tale belongs mainly to either of two classes, the short and sharp and single, charged more or less with the compactness of anecdote (as to which let the familiars of our childhood, *Cinderalla* and *Blue Beard* and *Hop O' My Thumb* and *Little Red Riding Hood* and many of the gems of the Brothers Grimm directly testify), or else the long and loose, the copious, the various, the endless, where dramatically speaking, roundness is quite sacrificed —sacrificed to fulness, sacrificed to exuberance, if one will; witness at hazard any one of the Arabian Nights. The charm of all these things for the distracted modern mind is in the clear field of experience, as I call it, over which we are thus led to roam...

'Nothing is so easy as improvisation, the running on and on of invention; it is sadly compromised, however, from

the moment its stream breaks and pounds and gets into flood... To improvise with extreme freedom and yet at the same time without the possibility of ravage, without the hint of a flood, to keep the stream, in a word, on something like ideal terms with itself...'

অর্থাৎ : রূপকথাকে মোটামুটি দুটি ভাগ করা যায় ; একটি হচ্ছে স্বল্পকায়, প্রখর অখণ্ড, খোশগল্পের বা কেচ্ছার মতো আঁটসাট (প্রমাণ শৈশবের চেনাশোনা সব রূপকথা : সিণ্ডরেলা, ব্লু বিয়ার্ড ইত্যাদি)। আরেকটি হচ্ছে দীর্ঘ, শিথিল, অপর্যাপ্ত, বিচিত্র, অন্তহীন, যেখানে নিটোলতা বিসর্জন দেওয়া হয় উচ্ছলতায় ; প্রমাণ আরব্যরজনীর যে কোনো একটি। বিপর্যস্ত আধুনিক মনের কাছে এদের বাহার হচ্ছে অভিজ্ঞতার পরিচ্ছন্ন ক্ষেত্রে যেখানে আমরা বিচরণ করতে পারি··· আলাপ বিস্তারের মতো সহজ আর কিছু নয়, নব-নব যোজনার একের পরে এক পরম্পরা ; কিন্তু সেও বিড়ম্বিত হয়ে ওঠে যে মুহূর্তে ধারাটি পাড় ভেঙে বন্যা হয়ে ওঠে···সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় বিস্তার করে যাওয়া, অথচ কূল ভাঙবে না, বান ডাকবে না, এককথায় ধারাটিকে বস্তুবিশ্বে আত্মসম্পূর্ণ রাখা···

এই সুরবিস্তারে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আজকের শ্রেণীগত জীবনযাত্রার বাহ্যরূপ মানবেতর ভেদাভেদ, অহেতুক সম্ভব-অসম্ভবের মানদণ্ড। আমাদের ভবিষ্যতের ছবি তাই অর্থনীতির পরের স্তরের মানবজীবনে খুঁজি, যেখানে জীববিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান অর্থোত্তর নিছক মানবসমাজের পুরুষার্থ নির্মাণে কর্মঠ। সেখানেই রিলকের নিঃসঙ্গতা ও জীবনের ঘনিষ্ঠতা একাধারে সম্ভব, সেখানেই প্রুস্তের স্মৃতির ইমারত, জয়েসের ভাষার বিহার ব্যক্তিগত চেষ্টার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান প্রত্যক্ষ জীবনের মুক্তিতে মনের গভীরতর সার্থকতা পায়। কাফ্‌কার মানসিক দ্বন্দ্ব সেখানে রূপকে সীমাবদ্ধ থাকার প্রয়োজন মানে না। তখনই লরেন্সের আশ্চর্য কবিত্বের অখণ্ড সত্তার স্বপ্ন বাস্তবে সম্পূর্ণতা পাবে। তাই তো সোভিয়েট দেশের মানুষ অস্ট্রভস্কির জীবন এক হয়ে যায় বীরত্বের মহাকাহিনীতে।

এ কথাটা শুধু কাব্য-উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সীমা বিস্তৃত হবে বলেই বলছি না। লেখকে পাঠকে যোগ ঘনিষ্ঠ হওয়ায় লেখকের শিল্পচর্চারই স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাবে। কনটেণ্টের সীমানা সেখানে জানা বলেই শিল্পী তদ্গত হতে পারবে কর্মের ধ্যানধারণায়। তাছাড়া মানতে লজ্জা নেই, বই বিক্রির বা লেখকদের

সম্ভাবনার যে ভবিষ্যতে কতখানি হতে পারে, সোভিয়েট ইউনিয়নে আমরা এরই মধ্যে তার কিছু দেখতে পাই এবং বিষয়ে আমরা যে কিঞ্চিৎ আগ্রহান্বিত, সেটা স্বীকার্য। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা মানুষের সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বরূপ সম্বন্ধে আমরা পাব আরো ব্যাপক জ্ঞান, আরো গভীর অনুভবশক্তি। তাই আজ কবিরাও আপন গরজে সে দীপ্ত ভবিষ্যতের নির্মাণে মন দেয়।

'The play of one's mind gave one away, at the last, dreadfully in action, in the need for action, where simplicity was all···'

অর্থাৎ : আমাদের মনের মুক্তিলীলাই, শেষপর্যন্ত আমাদের নিয়ে যায় দারুণ সক্রিয়তার বা কর্মের জগতে, কর্মের প্রয়োজনে, যেখানে সরলতাই সব···

৬

বীরবল থেকে পরশুরাম

আমাদের অক্ষমতার অনেকটা যে ব্যক্তিগতের বাইরের কারণে, বাংলা সংস্কৃতির, সমাজের, দেশের জীবনে ছড়ানো, সে বিষয়ে মোটামুটি সবাই একমত। অন্তত দেশের দুর্ভোগের ছবিটা কমবেশি স্পষ্ট তার ব্যাখ্যা আপাতবহু হলেও। বাংলার মানচিত্রই তার স্থূলপ্রমাণ, ১৯০৫ থেকে ১৯৫০-এ। আর ভাগ্যবান মুষ্টিমেয় ছাড়া কে না জানি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার গ্লানি, অপমান, অভাব, অত্যাচার। কোথায় সেই রামমোহন-বিদ্যাসাগরের, মাইকেল-দীনবন্ধুর, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের বাংলা, সেই মানস, এমন-কি সেই জীবনের পুরুষার্থ। তারই মধ্যে মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির শিবসদাগরের দুরবস্থা। শুধু যে সাহিত্যের প্রসারে বা মূল্যস্বীকারে তা নয়, বুদ্ধির দুরবস্থায় আজ আমরা কেউ বা বিমূঢ় ব্যথিত কেউ বা একেবারে অন্ধ। অথচ আমাদের এই অতীতহীন চাকুরিজীবী ভদ্রলোকের ছোট্ট এবং অগভীর সংস্কৃতিতেও চর্চা ছিল, চেষ্টা ছিল, সময়ে সময়ে প্রতিভার রসায়নে মহান কীর্তিও হত সূচিত।

সেই চর্চার পটেই শুভবুদ্ধির মাহাত্ম্যে একাধিক মনীষী বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত সমাজেই দুর্লভ সভ্যমানুষের বৈদগ্ধ্য লক্ষণ অর্জন করেছিলেন।

সম্প্রতি বীরবলের হালখাতা পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে, ঐ উপভোগ্য বইটির শিক্ষণীয়তা আজও ঘোচে নি! বীরবলের লিখননৈপুণ্যে শুধু নয়, তার মধ্যে বীরবলের যে লোকায়ত মানবতা, যে প্রত্যক্ষ ও যুক্তিসহ বিচারে আস্থা এবং সে বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রতিষ্ঠায় তাঁর আজীবন যে চেষ্টা তার প্রয়োজন আজও এত বেশি বাস্তব যে মনে হয় বীরবলের সভ্যতাপ্রচার বাংলাদেশের দিক থেকে বুঝি বৃথায় গেছে। বীরবলের হালখাতা শোনা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি পাঠ্য নির্বাচিত হয়েছে বা হবে। সুখের কথা, কিন্তু তা কতটা বীরবলের স্মৃতির পক্ষে তা বলা শক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যব্যবস্থা, পরীক্ষাব্যবস্থা, অন্যান্য বই নির্বাচন, সাহিত্যসংস্কৃতির রুচি ও বিচারবুদ্ধির স্থান এসব দিক থেকে বীরবলের

জ্ঞান ও রুচি, বুদ্ধিতে বিশ্বাস, তাঁর সন্ধানী মনীষা বিপরীতই বটে, ধোবার উঠানে তেজী তুরাণী ঘোড়ার মতোই। অবশ্য এ বিপরীত শক্তি, ভণ্ডুলবৃত্তি বাংলায় বরাবরই প্রবল। এরই জোরে বংগাল সরকার ও রবীন্দ্রসংস্কৃতির প্রসারে নয়, রবীন্দ্রস্মৃতি-পূজার উপহাসে মাতেন, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিককে পুরস্কার দেন, আমলাতন্ত্রের হাতে আবেদনের অপমান সইতে হয় প্রার্থীদের, কাগজে বিজ্ঞাপনের কদিনের মধ্যেই লটারির তারিখ শেষ হয়, বিচারকের নাম শিক্ষিতসাধারণদের আগে তো নয়ই, পরেও জানানো হয় না।

বীরবলের প্রায় প্রতিটি রচনাই তার প্রতিবাদী সাক্ষ্য, যার জন্যে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় নাকি বাংলার অধ্যাপক পদের যোগ্য মনে করে নি— দীনেশ সেনের পরে। দুর্বুদ্ধির বিপরীত শক্তির বিরুদ্ধে একদা বীরবলকে লিখতে হয়েছিল। "বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ", বঙ্কিমকে নামাতে হয়েছিল পৌরাণিক ভক্তির থেকে সমালোচনার মঞ্চে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বা বিপিনচন্দ্র পালকে হাস্যের বলদচক্ষু হিসাবে ব্যবহার করতে হয়েছিল মুক্ত বুদ্ধির মানবিক তাগিদেই।

বীরবল আমাদের সেই অত্যল্প কৃতবিদ্যদের একজন যিনি উনিশ শতকের বাইরে ইংরেজি সাহিত্যের অস্তিত্বের কথা জানতেন এবং ইংরেজির বাইরে একটা ইওরোপীয় সাহিত্যের খবর রাখতেন। ফলে তাঁরই পক্ষে সম্ভব হয়েছিল আপাতবিরোধী হলেও বাংলার ইংরেজেতর, লৌকিক সাহিত্যের শিকড় সন্ধান। তাই তিনি পদাবলী, চণ্ডী, মঙ্গল কাব্য থেকে ভারতচন্দ্র অবধি ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে— বলাই বাহুল্য গুরুচণ্ডালি না করে— উপভোগ করেন। উপভোগ করেন শুধু বিলাসী ব্যক্তির আতিশয্যে নয়, সাহিত্যিকের, বাংলা সংস্কৃতি-কর্মীর প্রাণের গরজে, শিকড়ের সন্ধানে। রুচি ও অগ্রগতির মান ছিল তাঁর মানবতায় জাগ্রত, কাজেই শিবে বানরে গোলমাল তিনি করেন নি। পরিবর্তনের আভাসইঙ্গিত, ইতিহাসের ধর্ম তিনি বুঝেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী তাঁর মতো বোদ্ধা খুব কমই মেলে, তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের কীর্তিতেই বাংলার আদিঅন্ত খোঁজেন নি। নাৎসি জর্মানির কাউন্ট হেরমান কেইসেরলিঙের কথা তাঁর মনঃপূত হয় নি। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের যে উৎসে ও প্রসারে মুখ্যত ইংরেজিশিক্ষিত মুষ্টিমেয় কৃত্রিম মধ্যবিত্ত এবং সময়হিসাবে শুধুই উনিশ শতকী সংস্কৃতি, তার সঙ্গে তাই যোগ খুঁজেছিলেন বিস্তৃত লৌকিক শিল্পসাহিত্যের ধারার, ব্যাপকতর অতীতের ও বর্তমানের। আমাদের আগের পুরুষের "প্রগতিরহস্য" তাই তাঁকে যন্ত্রণায় হাসিয়েছিল।

তাই তিনি ভবিষ্যৎ ভেবে কাতর হন নি, ইঙ্গবঙ্গের ব্যাপ্তিও চান নি, হিঁদুয়ানিও চান নি তাঁর এই চোখখোলা কঠিন সাধনার আস্থা আজও আমাদের আত্মীয় লাগে।

সাধনা যে কঠিন তার প্রমাণ বীরবল বারবার দিয়েছেন। এমন-কি পরিবেশের প্রভাব পরোক্ষে হয়তো তাঁর রচনাতেও স্পর্শেছে। তারই জন্যে হয়তো ব্যঙ্গের স্রোতে তাঁর লেখনী হয়ে ওঠে থেকে-থেকে অতি চপল, হাস্য হয়ে ওঠে অপেক্ষাকৃত স্ফীত, যেমন হয়েছে "আমরা ও তোমরা"-য়। অবশ্য তাঁর পরিবেশ ছিল পরাক্রান্ত; গ্রামভারী মূর্খতা, প্রাদেশিকতা, কূপমণ্ডুকতা, যুক্তিহীন বুলি, অন্ধ বিশ্বাসের নেকড়ের পালের মধ্যে তাঁর কর্মক্ষেত্র। তাঁর নৈঃসঙ্গ্যে প্রায় একমাত্র আশ্রয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, একমাত্র কিন্তু প্রবল, আলোকসামান্য প্রতিভার মহীরুহ। আম বা জামে হয়তো সে কীর্তির তুলনা নয়, কিন্তু বট বা পিপুলে বটে। এবং প্রমথ চৌধুরী তা জানতেন, বহুবিস্তৃত প্রতিভার শতঝুরি ছায়ায় তিনি নিশ্চিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর রচনাবলী ও ব্যক্তিস্বরূপকে তিনি অর্ঘ্য দিয়েছেন কিন্তু অনুকরণ করেন নি, রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পাশে প্রমথ চৌধুরীর প্রাকৃতদৃষ্টি সত্তা তাই আজও বিস্ময় ও সম্ভ্রমের বিষয়। তাঁর চেয়ে দুরস্থ ও দুর্বল অনেকেই ভেবেছেন যে রবীন্দ্রনাথ অনুকরণীয়। ভেবেছেন ও ভাবছেন যে রবীন্দ্রনাথের বাংলা সাহিত্যে রূপকর্মের উত্তরাধিকার নয়, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তাও অনুসরণীয়। এ যে শুধু মদালসের বিলাস তা নয়, এ নকলী মানবতার সৌকুমার্য, এর আন্তর্জাতিক আত্মিক মৈত্রীর বাণী চরিত্রের দিক থেকে মারাত্মক মিথ্যা।

কারণ সে প্রচণ্ড গতি অবসান, হিমালয় সংহতিতে একক। অথবা বলা যায়, সে জলধারা লঘুবায় তুষার দেশের স্বচ্ছ নীল হ্রদে আত্মস্থ। কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পপ্রতিভার সঙ্গে মেলান তাঁর মানসশক্তির চূড়াপ্রাচীর, তাঁর সমাহিত শান্ত বিশ্বাস। বঙ্কিমের মতো অপেক্ষাকৃত স্থূল ও অসংহত ধর্মাশ্রয়ী বিশ্বাস নয়; সুকুমার, মার্জিত, আরো মৌলিক, কবিকর্মের দিক থেকে ঈসথেটিক দিক থেকে আরো সমগ্র সংহত এক অধ্যাত্ম বিশ্বাস। এর প্রচণ্ড সত্য ও সততা রবীন্দ্রনাথের অনুপম জীবনের ও সাহিত্যের সৌন্দর্যে ব্যাপ্ত, মাঝে মাঝে সমাহিত একাত্মতা তাঁর ভেঙেছে, বহির্জগৎ এসে হানা দিয়েছে বসুন্ধরার বেশে, কন্যার বেশে— যেতে নাহি দিব বলে। শেষ বয়সের কবিতায় তিনি আবার রিক্ততার, ছলনার প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন রূপনারানের

কূলে, যেখানে ছলনাময়ীর মুখে মেলে না উত্তর। তবু মোটামুটি রবীন্দ্রনাথের ধ্যানের অচ্ছোদ মানসসরোবরের নীলিমায় মাটি লাগে নি। সেখানেই তাঁর সৌন্দর্যের অপূর্বতা; তাঁর ব্যক্তিগত সামাজিক নৈঃসঙ্গ্য আত্মিক নৈঃসঙ্গ্যের যন্ত্রণায়, নেতির দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয় নি, সেই তাঁর বৈশিষ্ট্য; তাই তাঁর চারিত্র্য ইয়েটসেরও প্রণম্য।

এবং এই একাত্ম অধ্যাত্ম-বিবেকে তাঁর সাযুজ্যই তাঁকে করেছে সুন্দর ও সৌন্দর্যের অনুরাগী, প্রকৃতির প্রিয় ও প্রেমিকও। সেইজন্যেই তাঁর সুন্দরে মিলেছে সত্য ও মঙ্গল। তাঁর এই অধ্যাত্মসিদ্ধি ইংরেজ সৌখীন ঈসথীটদের আয়ত্তের বাইরে। এর সম্পূর্ণতা ও বহুবিধ প্রকাশে বাংলাদেশে আমাদের হৃদ্‌বৃত্তি, সংবেদ্যতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ-বিষয়ে অনুরাগ, প্রকৃতির সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতির আরম্ভ ও বিকাশ যেমন সত্য, তেমনি সত্য এর ভিত্তি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ঐ অধ্যাত্মসিদ্ধির অননুকরণীয়তা। তাছাড়া, আমরা কজনই বা ভাবলোকের নিত্যস্বর্গে বসবাসের ক্ষমতা বা ইচ্ছাই রাখি বা সে লোকোত্তর আস্তিক্য চাই? আর রবীন্দ্রপ্রতিভার কাব্যপরিক্রমায় তার দরকারই বা কি? প্রমথ চৌধুরী উদারতন্ত্রী অর্থাৎ আস্তিক্যহীন বুদ্ধিবাদী থেকেই তাঁর মানবতার সমরেখায় রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মোৎসারী কিন্তু টমাস মোরের মতোই প্রকৃত মানবতার প্রসাদ মিলিয়েছিলেন।

অনুকরণের এই সমস্যাতেই এক কবিসমালোচক লেখেন যে কবি-মার্গের আদর্শ হওয়া উচিত মহাকবি দান্তে, কারণ তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ মর্ত্যের মার্গে, পদচারী মানুষের অনুসরণীয় কিন্তু মহাকবি শেকস্‌পিয়র অনুকরণের উর্ধ্বে স্বকীয় প্রেরণায় আকাশচারী।

তাছাড়া, সমাহিতি কি আমাদের সাধ্যে? ত্রিশঙ্কুত্বে কি শেষে আমাদের পরিণাম? না, আমাদের বর্তমানে আমরা ভবিষ্যৎ চাই, পরিবর্তনে আমাদের আশ্বাস? যুক্তিতে, ন্যায়বুদ্ধির মুক্ত প্রাত্যহিক পদাতিক অভিযানে চেষ্টায় আয়ত্তে আনতে চাই সমাধানের অভাব, শান্তির অনটন, অন্যায় অনর্থ নিঃশেষ করতে চাই প্রাথমিক স্বীকারে নয়, উপসংহারে? দেখা যাচ্ছে এ বিষয়ে বাদবিবাদে ঝোঁক পড়ছে দুদিকেই একপেশে, একচক্ষু হরিণ শুধু-শুধু ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের উত্তরাধিকার স্বীকার করতে গিয়ে তাঁকে লেনিনের সঙ্গে তুলনা বাহুল্য, বরং টলস্টয়ের বিচারের সঙ্গে খানিকটা তুলা তাঁর বিচার। আবার, তাঁর বিচিত্র দান সিপাহী-বিদ্রোহের অজ্ঞাত

কাল্পনিক সাহিত্যে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও অর্থহীন। সমালোচনা আজও আমাদের একান্ত প্রয়োজন। প্রমথ চৌধুরীর সমসাময়িক আবহাওয়াতে যে চেষ্টা ছিল, তা আমরা আজকের বহুবিধ সুযোগ কেন সম্পূর্ণতর করা প্রয়োজন মনে করব না ?

১৩১৪ সালে বঙ্গদর্শন-পত্রে এই রকম সমালোচনার একটি সুলিখিত উদাহরণ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের অনুমতিতে প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথ লেখককে ডেকে আলাপ করেন এবং এ প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের জবাবে বঙ্গদর্শনেই রবীন্দ্রনাথের দুঃখ নামে ওজস্বী লেখাটি বেরোয়। পাঠকেরা লক্ষ্য করে থাকবেন, বহুকাল পরের বিখ্যাত কবিতা—যৌবন-বেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলিতে এই প্রবন্ধের মূল প্রশ্নটি কবি আবার তুলেছেন।

বলাই বাহুল্য, শ্রদ্ধেয় লেখকের সমস্ত মতামত হয়তো আমাদের পক্ষে ঠিক ঐভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। অক্ষয়বাবুর সতর্কবাণীর পুনরুক্তি করে, আবার বলা ভালো, মহাকবির সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ অবতারণায় তাঁর জীবনবেদ গ্রহণের কথা নেই; যেমন নেই বঙ্কিমের কোনো সার্থক উক্তি উদ্ধৃতিতে বঙ্কিমের সমালোচনা বর্জনের নীতি।

এ কথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধ্যাত্মঅন্বয়ে সাহায্য পেয়েছিলেন তাঁর পটভূমিতে, পারিবারিক ও সামাজিক। এবং পরোক্ষ সাহায্য পেয়েছেন উপনিষদের যে দিকটা কর্মকাণ্ডহীন আধ্যাত্মিক, ঈসথেটিক, সেই উৎসে। বৈষ্ণবকাব্য ও বাউলসাধনা তাঁর সমন্বয়ে সহায় ছিল। কিন্তু তাঁর মূল সহায় ছিল প্রকৃতি, নিসর্গপ্রকৃতি। ঠিক ওঅড্স্‌ওঅর্থের প্রকৃতি নয়, কারণ তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ স্বকীয় স্বতন্ত্র, কারণ বাংলাদেশে যন্ত্রবিপ্লব আঠারো শতকের শেষে ইংলণ্ডের সঙ্গে তুলনীয় নয়, কারণ ভারতীয় ধর্মসাধনা ইংলণ্ডের গির্জাসাধনা নয়। কিন্তু সেইরকম প্রকৃতি-ঘটিত গভীর একটা অভিজ্ঞতাই, যার অঙ্কুর সদর স্ট্রীটেই কিন্তু বিকাশ পদ্মার চরে-চরে। তাই তিনি বলেছিলেন শুধু সাহিত্যিক হলে হয় না, দাঁড়াতে হলে চাই আর কিছু আবেগ, একটা প্রিডমিনেটিং প্যাশন্. আমি কবি হিসাবে দাঁড়িয়ে গেলুম প্রকৃতিকে ভালোবেসে; মানুষকেও আমি ভালোবেসেছি, কিন্তু প্রকৃতিই আমাকে বাঁচিয়ে দিলে। এই অধিষ্ঠাতা আবেগ ভারতীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান; তাঁরই গানে কবিতায় গদ্যে প্রকৃতি এল আমাদের ইন্দ্রিয়বেদনে, নানারূপে, চোখে কানে হৃদয়ে চিন্তায়।

সে প্রকৃতি মুখ্যত হিংস্র নয়, হিংস্র হলেও শেষ পর্যন্ত বিরুদ্ধ নয়; তার

কারণ এ নয় যে প্রকৃতি, এ প্রকৃতি পশ্চিম ইওরোপের মতো মানুষের প্রায় পোষা প্রকৃতি, কারণ রবীন্দ্রনাথের এ প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত একাত্ম, ঈশ্বরেরই অর্থাৎ এক হিসাবে নির্বিশেষ মানুষেরই বাহির-রূপ। জীবন তাই তাঁর কাছে মৃত্যুর প্রতিবাদ নয়, পরিপূর্ণতা। তাই মানুষের জীবনের দ্বন্দ্ব তাঁর কাছে ট্রাজেডি নয়, ট্রাজেডির উর্ধ্বে। ট্রাজিক দৃষ্টিতে জীবন বিরুদ্ধশক্তির সংঘাত, জয়পরাজয়। তাই ক্রিস্টোফর হিলই লিখতে পারেন: ইতিহাস তো ট্রাজেডির উত্তরণ-পরম্পরা। হ্যামলেটের মৃত্যুর পরেও ডেনমার্ক থাকে, দেশবাসী থাকে, ফর্টিনব্রাস থাকে, হোরেশিও-ও। অবশ্য ব্রহ্মণ্যচিন্তায় জীবনের উপমা ট্রাজেডিতে দুর্লভ, উপমা মেলে মাস্কে, প্যাজেন্ট্রিতে। জাতিভেদ, জন্মান্তর, কর্মফলের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় তাইতো সম্ভব। প্রতিবাদের প্রতিষেধক আছে; কারণ সবই তো এক, পরমাত্মার অংশ, তোমার অনাহার ও আমার ভূরিভোজজনিত অজীর্ণ আখেরে অভিন্ন। যে আর্য-অনার্য, ব্রাহ্মণশূদ্র, কর্তা-দাস ব্যবস্থায় এই একাত্ম-দর্শনের অনীহার ভিত্তি, সে বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিরা চর্চা করবেন। অবশ্য সে চর্চায় সংক্ষেপে করায় বা সত্যের অপলাপে লাভ নেই, যার ফলে ডাঙ্গে-র বৈদিকযুগের উপর বইটি প্রশংসনীয় চেষ্টার নমুনা হলেও এঙ্গেলসের কথার যান্ত্রিক প্রয়োগের ফাঁকিতে স্থানকালপাত্রজ্ঞানের অর্থাৎ ইতিহাসের অভাবে বিপজ্জনক সরলীকরণ।

মুশকিল হচ্ছে আমাদের ইতিহাস মোটেই সরল নয়, তাতে কালের ও নানা পাত্রের নানান জট, এবং সে জট খোলবার জ্ঞান সমধিক প্রয়োজনীয় হলেও তথ্য কম এবং পণ্ডিতদের ধৈর্যও দুর্লভ। তাই ডাঙ্গে বামের সোজা পথে চলে দিশাহারা, সমস্ত বৈদিক যুগটি তাঁর কাছে পরিবর্তন-বা-বিবর্তনহীন একটি স্থাবর মুহূর্ত, পুরন্দর ইন্দ্র গোষ্ঠীদেবতামাত্র, লোহা ও ঘোড়ার কোনো ঐতিহাসিক তাৎপর্য নেই, মুদ্রা বা যজমানপ্রথা বা বশিষ্ঠের জুয়াড়ীসমস্যা ডাঙ্গের পক্ষে ওঠেই না, অনার্য-আর্য সমস্যা তিনি সরল করেন অনার্যের প্রমাণ নেই বলে বাদ দিয়েই।

আমাদের কাছে ব্যাপারটা জরুরী হয়ে দাঁড়ায় যখন এবংবিধ আরোপ রচয়িতা বা সৃষ্টিশীল সাহিত্যে জারি করা হয়। এই সাহিত্যিক আরোপের তলাতেও ঐ সরলীকরণ, তা সে কি বঙ্কিম কি রবীন্দ্রনাথ আলোচনায়। কখনো বা এই সরলীকারী টোটকাপ্রয়োগের সঙ্গে মেশে আপাতজ্ঞানী তোতাবুলিও। কিন্তু তাতে গালন্দাজ ইচ্ছা পূরণ ছাড়া সাহিত্যে প্রগতির কিছু সুরাহা হয়

না। কোনো বিশেষ লেখকের বিচারে কি দ্রষ্টব্য তাই এ সমালোচকরা অহমিকার ও থিওরির মিশ্রণে ভুলে যান এবং সাহিত্যের প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্রে নিমেষ-পাতই করেন না। অথচ যেমন ইতিহাসে, তেমনি স্বতন্ত্রভাবে সাহিত্য-বিচারেও জট আমাদের খুলতে হবে, সংগত দৃষ্টির ও আপেক্ষিক উক্তির জটিল ও ধৈর্যশীল পথেই আমাদের ভবিষ্যৎ, যান্ত্রিক প্রয়োগের লোভে বা ভাববিলাসের আশু-তৃপ্তিতে দক্ষিণ থেকে বাম, বাম থেকে দক্ষিণাচারে যেন আমরা না ভুলি।

তাঁর মূল্যবান মহাভারত ভূমিকায় রাজশেখর বসু বলেছেন : তাঁরা শ্মশান-বৈরাগ্য প্রচার করেন নি, বিষয়ভোগও ছাড়তে বলেন নি ; শুধু এই অলঙ্ঘনীয় জাগতিক নিয়ম শান্ত চিত্তে মেনে নিতে বলেছেন।

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃসমুচ্ছ্রায়াঃ।
সংযোগ্য বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবিতম্॥

সকল সঞ্চয়ই পরিশেষে ক্ষয় পায়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়। মানুষ অদৃশ্যস্থান থেকে আসে, আবার অদৃশ্যস্থানেই চলে যায়, তারা আপনার না, আপনিও তাদের নন।

এই শান্ত কর্মৈষণাতেই আমাদের ভারত অন্বেষার আরম্ভ, আমাদের ইতিহাস সন্ধানের সূত্রপাত, পরিবর্তনের, দ্বন্দ্বের, বৈপরীত্যের গ্রহণে। অবশ্যই অধ্যাত্ম-সান্ত্বনাতেও মহাভারত জর্জর, তবু তাতে ধৃতরাষ্ট্রের টাইরেশিয়স্-শোভন বিলাপ আছে, গান্ধারীর কুরুক্ষেত্র দর্শন আছে, যদুবংশ ধ্বংসের অপরূপ রূপক আছে। ট্রাজিক চরিত্রে ও নাট্যে মহাভারতের যে বিস্রস্ত ঐশ্বর্য তা সৌতি ধৌম্যেরাও চাপা দিতে পারেন নি। একাত্মসাধনার সঙ্গে সঙ্গে এই ভেদবিরোধ ও তার ফলে করুণ বিয়োগ আমরা মহাভারতে পাই। ঐ প্রথমটির প্রভাবেই তো অর্জুন স্টেটাস্ ক্যো-র বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে কোনো সার্থকতা খুঁজে পান নি, তাই সে সংকটে আজগুবির উদ্ভব, একাত্ম সমাধির সঙ্গে অনেকাত্ম বাস্তবজীবনের বিরোধে, যুদ্ধের বর্ণসংকর দর্শনের মহাকাব্য। যুদ্ধ অবশ্য হল, নির্বিত্ত পাণ্ডবের জয়ও, কিন্তু অর্জুন আবার ভুলে গেলেন গীতার উপদেশ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নির্বাহ তাহলে গীতার শুদ্ধ জ্ঞানে নয়, ক্ষাত্রস্বার্থের তাগিদেই গীতার সাময়িকতায়।

মহাভারতের মতোই আমাদের ঐতিহ্যের অনেক কিছুই মিশ্র। অনড় ঐতিহ্য বাস্তব হয়ে ওঠে আমাদেরই বিশিষ্ট অন্বেষায়, বিশিষ্ট উত্তরাধিকার

ব্যবহারের নির্দিষ্ট প্রয়োজনে, প্রস্তুতিতে, বিন্যাসে। এবং সে বিন্যাসকে সরলীকরণের অঙ্গীকার জীবনের বাস্তবতায় নেই। এমন-কি সাহিত্যিক সরলীকরণেও নয়। চণ্ডী বা আলাওল বা মঙ্গলকাব্যে যে দেশজ বাস্তবতা ধর্মের প্রলেপ এবং সংকেতিত মার্গ সত্ত্বেও পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের শিল্পোৎকর্ষের সঙ্গে বা প্রকৃতিপ্রেম বা আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে সমপর্যায়ে অর তুলনা অর্থহীন, কিন্তু ঐতিহ্যের নির্মাণে তার সন্ধানও দরকার। এমন-কি ঐ ধর্ম ও সংকেতিত মার্গের মধ্যে দিয়েই পাওয়া যায় লৌকিক মনের সৃষ্টিময় বিরোধের ইতিহাস, আপস কিন্তু সংঘাতের আততিরও আভাস। ঐ বাস্তবতার মানসাধিকারই দীনবন্ধু মাইকেল কালীপ্রসন্নের রিয়ালিস্‌মের শিক্ষিত ধারার নিহিত দেশজ ফল্গু —আর্নল্ডের সেই আরাল হ্রদের অন্বেষায় বালুচড়া আমুদরিয়ার মতো, আজ যার স্রোত কাস্পিসাগরে—ইলিনের ভাষায়, মানুষ আর পাহাড়ের মিলনসংগঠনে। সে সংগঠনে বীরবল-প্রমথ চৌধুরীর তীক্ষ্ণ মনন মূল্যবান সহায়, সে কাজে যুক্তিবাদী পরশুরাম-রাজশেখর বসুর পরিমিত হাস্য ও পরিমিত জিজ্ঞাসাও আমাদের পথের খোরাক।

আমাদের এই সন্ধান দরকার, কারণ আমাদের দেশে ইওরোপের পণ্যবিপ্লব হয়নি, বুর্জোয়াসির বিকাশও হয় নি, আমাদের জাগৃতি অসম্পূর্ণ, মৌলিক নয়, বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। তাইতো উপন্যাস আজও আমাদের সাহিত্যে ঠিক ভিত পাচ্ছে না, তাই আমাদের সংগীত আজও একস্বরাশ্রয়ী সরলরেখা, আমাদের চিত্রশিল্প দ্বিমাত্রিক, নগরস্থাপত্য অস্তিত্বহীন। রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের মধ্যে কতবড় প্রতিভার ব্যতিক্রম, তা তো আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, সাংস্কৃতিক সামাজিক জীবনের দিকে তাকালেই, ব্যক্তিগত স্থূলতার কথা ভাবলেই স্পষ্ট হয়ে যায়— আমাদের লজ্জায় ও গ্লানিতে।

অথচ আমরা ঠিক আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার আদিম মানুষ নই। দীর্ঘ ও জটিল ঐতিহ্যের দায়ভাগ আমাদের লৌকিক শিল্পসংস্কৃতিতে আজও মেলে। সে দায়ভাগের জোরে আমাদের জনপদনির্মাণ পশ্চিম ইওরোপের অনুকারী না হলেও চলে। সেখানকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন এখানে যথার্থ নয়, আমাদের লোক-জীবনের দায়ভাগে রিয়ালিসম্ নেচারেলিসম্ সিম্বলিজম্ প্রভৃতির লড়াই অলীক। বাস্তবতা এবং প্রতিকমার্গ বা এবস্ট্রাক্টরীতি আজও আমাদের সাধারণ মানুষ সহজেই মেলাতে পারে। সেই জন্যেই এলিক ওয়েস্টের মনে হয়েছে যে আমাদের সমাজতন্ত্রী সংস্কৃতির পথ পশ্চিম ইওরোপ থেকে ভিন্ন, এক হিসাবে

আরো সহজে সার্থক, কারণ আমরা রেনেসাঁসের সম্পূর্ণ সুযোগ যেমন পাই নি, তেমনি লৌকিক শিকড় আমাদের একেবারে মরে নি। মরা-না-মরা অবশ্য আমাদেরই হাতে। কোনো কাল্পনিক দামোদরভ্যালি করপোরেশনের নয়। কিন্তু জলের সন্ধান ছেড়েও নয়।

৭

রাজায়-রাজায়

রাজায়-রাজায় লড়াইয়ে মুশকিল হয়েছে সাধারণ সাহিত্যিক ও সাধারণ পাঠকের, জনসাধারণের রুচিতে হয়েছে সমুদ্রমন্থন। সাহিত্য-সমালোচনায় বিশেষ-বিশেষ রাজনীতির স্বকপোলপ্রযুক্ত মতবাদের বা ব্যক্তিগত কোনো নীতির মানদণ্ড পরিচালনা দেখে আমরা কমবেশি বিমূঢ়। প্রথমত, মতবাদগুলিতে যথেষ্ট বিজ্ঞান-মূলক স্বচ্ছতা নেই, দ্বিতীয়ত, না সমাজ না সাহিত্য বিচারে বা উভয়তই এ বর্জননীতি ও অশ্রদ্ধা কোনো বিকাশের অনুকূলও নয়। এবং যে সমালোচনায় সাহিত্য-রচনার ধারা বা পাঠকমনের কোনো বিকাশে সাহায্য নেই, সে সমালোচনার ধারাও পুনর্বিবেচ্য।

উদাহরণস্বরূপে এবং একটি উদাহরণ স্বরূপে বুদ্ধদেব বসুর ইংরেজ পাঠকের জন্যে লেখা আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ে মূল্যবান বইটি ধরা যেতে পারে। বুদ্ধদেববাবুর দীর্ঘ সাহিত্যিক নিষ্ঠা ও সাহিত্যসৃষ্টি আমাদের শ্রদ্ধার বস্তু, তাঁকে অসম্মান করতে আমি অক্ষম। কিন্তু দলীয়তা ও রাজনীতির কল্পিত বিকারে ও প্রতিবিকারে তাঁর 'শুদ্ধ' সাহিত্যবাদও যে কিরকম ভারাক্রান্ত, তার লক্ষণাভাস যে সাহিত্যিক কর্তব্য, সেই বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

রবীন্দ্রনাথেই বুদ্ধদেববাবুর 'অ্যান একর অফ গ্রীন গ্রাস' আরম্ভ। রবীন্দ্র-নাথের প্রতিভার আশ্চর্য সম্পূর্ণতার যে তিনি মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন, তাতে যেমনি খুশি হয়েছি বুদ্ধদেববাবুর সাবেক ও পীড়াকর রবীন্দ্রবিরোধিতার প্রায়শ্চিত্তে, তেমনি খুশি হয়েছি স্বমতেরই সুষ্ঠু প্রকাশে। রবীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড প্রতিভা ও বিরাট বিকাশের সঙ্গে প্রাকৃতিক ঘটনা ছাড়া আর কিসের তুলনা করা যায়? কয়েক বছর আগে ভারতীয় প্রগতিলেখক সম্মেলনের জন্য আমিও তাই করেছিলুম। বুদ্ধদেববাবুর মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও উন্নাসিক লেখকও সে কথা বলায় আত্মপ্রসাদ স্বাভাবিক। ইংরেজ কবি চসরের তুলনাটিও রবীন্দ্রনাথের

ঐতিহাসিক মহত্ত্ব বুঝতে সাহায্য করে। ঐ প্রবন্ধে তার সঙ্গে আমি অবশ্য জর্মান্ গয়টের উপমাও পাঠকদেব কাছে প্রস্তাবিত করি।

বুদ্ধদেববাবু ঠিকই বলেছেন যে বাংলার স্বল্পকায়— কিন্তু হয়তো গভীব— ঐতিহ্যের ধারায় রবীন্দ্রনাথের বিবাট আবির্ভাব একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। এ প্রচণ্ড আবিষ্কারে আমরা যদি দিশাহারা হই তো সে মার্জনীয়। আমাব এ সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবে এ প্রতিভার পরিচয় দেওয়া অসাধ্য, যদিও সাতবছর কেটে গেল সে প্রচণ্ড গতি অবসান। অথচ তাঁর তুলনা অন্য সাহিত্যেও ঠিক পাওয়া যায় না। একদিকে চসব অন্যদিকে গয়টে বা হুগো মিলিয়ে হয়তো খানিকটা ঐতিহাসিক তুল্যাভাস দিতে পারেন। তাঁর কীর্তিতে বাংলা সংস্কৃতির অপরিসব কিন্তু তীব্র সুবে এল অনেক বিন্যাস, তাঁর প্রতিটি বই টেকনিকের পদক্ষেপে স্পষ্ট প্রগতি ও বিষয়বস্তুব সীমান্ত বিস্তাব। তাছাড়া তিনি আমাদের শেখালেন শালীনতা। মার্জিত রুচির এ উত্তবাধিকার অস্বীকার আব কোনো গোঁড়ামিতেই সম্ভব নয়। বাংলাব প্রাদেশিকতায় তিনি আনলেন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিশ্বেব মানদণ্ড। কবি-বোমাণ্টিকেব পবিবর্তন-অভীপ্সা ও বোমাণ্টিক তেজ ও পুনর্নিমাণেব শক্তি, হৃদয়বৃত্তিব সূক্ষ্ম সৌকুমার্য ও পেলবতা তাঁবই দান। সৌন্দর্য-তত্ত্বেব প্রথম পবীক্ষাতেই প্রয়োজন যে নিছক সৌন্দর্যের চেতনা, সেই প্রাথমিক অঙ্গীকারও ববীন্দ্রনাথেই হল প্রথম প্রতিভাত। ভিক্টোরীয় চবিত্রেব বলিষ্ঠ সততা, শিল্পকর্মেব দায়িত্ববোধও ববীন্দ্রনাথেব রচনা। ব্যক্তিব যে স্বকীয়তাবোধ, সেনস্ অফ প্রাইভেসি, তাও রবীন্দ্রোত্তব সমাজেই বাংলাব মানসে স্পষ্টতর। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যই ছিল তাঁর ব্যাপক কর্মক্ষেত্র, তবু তাঁব ব্যক্তিস্বরূপ ও কীর্তিব তুলনা নদীব ক্ষেত-ভাসানো স্রোত নয়, সংহতসত্তা একক হিমালয়েব হ্রদেই তাঁব উপমা, যেখান থেকে অবশ্য খাল বওয়ানো যায়, বিদ্যুতের নিয়ন্ত্রণঘর গড়া যায়।

বুদ্ধদেববাবু চমৎকাব বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথের তৃপ্তিহীন প্রাণময়তাব অশীতিবর্ষব্যাপী সমগ্রতা। এই প্রাণময় অগ্নিতেই টেকনিকের নব নব বিকাশে বিষয়ের দুবার প্রসাব, এই দীপ্তগীতে একা একা সে অগ্নিতে, সৃষ্টি করি স্বপ্নেব ভুবন— শেষটা তিনি চরম স্বচ্ছতায় তাঁর পটভূমি প্রায় পিছনে ফেলে আমাদেব আধুনিক জীবনের মহত্তম কবি হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর নক্ষত্রবিহাবী প্রতিভা বাংলার মাটিতে মানুষ আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তবতায় আপন মহত্ত্বে বাববার বাহু নামালেও মূলত তা বহু ঊর্ধ্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ—প্রায় যেন কোনো প্রাকৃতিক মাহাত্ম্যের মতো।

রবীন্দ্রনাথের কীর্তিবিবেচনায় তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য স্বীকারে তাই আসলে তাঁকে শ্রদ্ধাই হয় সম্পূর্ণ। বাংলার ঐতিহ্য ও তাঁর প্রতিভা দুইই এ সংজ্ঞা-সম্পূরণে অপেক্ষাকৃত সুবোধ্য হয়। বুদ্ধদেববাবু যে কবিত্ব-শোভন বাক্যে বলেছেন যে, 'তিনি সৃষ্টি করলেন ভাষা, গদ্য ও পদ্য দুইই।' সেটা নিশ্চয়ই তাঁর পৌরাণিক অসতর্কতা, যেমন তিনি বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের চসর, শেক্‌সপীয়র, ড্রাইডেন, বাইবেলের ইংরেজি অনুবাদকবৃন্দ, ওয়্যাট্, সারে, স্পেন্সর, মার্লো, শেলি, সুইনবর্ন থেকে তরুণ বয়সের এজ্‌রা পাউণ্ড অবধি। নিশ্চয়ই তিনি মার্লোর ও শেক্‌সপীয়রের দুর্ধর্ষ গ্লানি ও উল্লাসের ঝঞ্ঝামত্ত নাম অসাবধানেই জুড়ে দিয়েছেন? নাহলে স্কটের সঙ্গে তুলনায় ক্ষান্ত না হয়ে তিনি কি করে রবীন্দ্রনাথের 'মোর অ্যাবানডান্‌ট্' শিশুকাব্যে ব্লেকের ইনোসেন্‌স্— শুধু ইনোসেন্‌স্ নয়, ব্লেকের ইনোসেন্‌স্ মিশ্রিত পেলেন 'উইথ অ্যান অলমোস্‌ট্ সফিস্‌টিকেটেড হিউমর'-এ?

আসলে বুদ্ধদেববাবু সর্বদাই কাব্যরচনার ন্যায্য অতিকথনের ভক্ত কিন্তু আজকাল ঐতিহাসিক তথ্য নিয়েও তিনি আকুল। তাইতো তিনি বঙ্কিমের নিজেরই গদ্যের ক্রমবিকাশের তথ্যটা চেপে গিয়ে বঙ্কিমের 'স্টিফ ফর্মালিজ্‌ম্' বলে দুটি শব্দে তাঁর বিচার সারেন, রবীন্দ্রনাথের গদ্য কমেডিকে বলেন, 'আর্লি শেক্‌সপীরিয়ন ইনটেম্‌পার' অথচ মাইকেল-দীনবন্ধুর যে প্রাক্-শেক্‌সপীয়রীয় মেজাজ কমবেশি বাংলা নাটকে চলেছিল, সে বিষয়ে একবারও ভাবেন না। শুধু রবীন্দ্ররচনাবলীতেই তিনি পান এলিজাবিথান্ 'মাল্‌টিপ্লিসিটি'— ইরাস্‌মস্, মুর্, ড্রেক্, রলে, বেকন, হুকর-মুখর, সেনেকা, মনটেন, মাকিয়াভেলি, মিরাকল্, মরালিটি-আন্দোলিত; ব্যারন্ ব্যবসায়ী সমুদ্রযাত্রী এলিজাবিথন্-দের বহুধা-বৈচিত্র্য। কিন্তু সেই নব্য ইওরোপের বহুমুখিতাকে আবার তিনি দেখেন রবীন্দ্ররচনাবলীতে 'ইউনিফায়েড' এবং কিসে একীকৃত? না ধর্মে। তাই কি তিনি পান রবীন্দ্রনাথে শুধু 'সুইট ওঅর্‌ম্‌থ্'? অবশ্য বুদ্ধদেববাবু মিষ্টির ভক্ত, তিনি আরনল্ডে-র গদ্যে পান 'সুইটনেস অফ্ স্টাইল' এবং মণীন্দ্রলাল বসুতে পান 'এ সুইট ল্যাঙ্গুইড অ্যাটমস্‌ফিয়র'।

কিন্তু এ ভুল শুধু বুদ্ধদেববাবুর একার স্বেচ্ছাচার ভাবলে ভুল করা হবে; 'হিসটরিক্যাল, হি ইস আওয়ার এলিজাবিথান রেনেসান্স', বুদ্ধদেববাবুর একথা তিনি যাদের সাহিত্যের কূলে প্রহ্লাদ মনে করেন, সেই বঙ্গীয় বামপন্থীরা অনেকে বলে থাকেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, কোন জাগরণের পুনরুত্থান? কোন

ঐতিহ্যের রেনেসান্স? ইংরেজি শিক্ষা কতখানি জাগাল আমাদের কোন অতীতটিকে? কতখানি কিভাবে জাগাল আমাদের সভ্যতার ছকের ঐতিহাসিক উপলব্ধি? আমাদের মুষ্টিমেয় খণ্ডিত ও ত্বরাগ্রস্ত জীবনযাত্রায় যে মুখ্যত চাকরিঘটিত পরিবর্তন এল তা কি ইওরোপের সামুদ্রিক ব্যবসায় ও যন্ত্রশিল্প-মূলক সভ্যতার তিন শতাব্দীব্যাপী বিকাশের সঙ্গে তুলনীয়?

এইসব প্রশ্নের সম্ভাবনাও যদি মনে না আসে তাহলে অবশ্য উত্তর পাবার জন্যে চিন্তাও ওঠে না। এবং ফলে বাংলা বিচাব ও ঐতিহাসিক তথ্যসন্ধান অসম্পূর্ণ থেকে যায়, ফলে মনে হয় যে দশ-এগারো শতক থেকে অষ্টাদশ উনিশের অর্ধেক অবধি বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যও ছিল না, বাংলাদেশও ছিল কি না সন্দেহ। তাই বুদ্ধদেববাবু রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর একক প্রতিভায় দোসর খোজেন এবং ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল, দীনবন্ধু কিয়দংশ বঙ্কিমেরও লোকায়ত দান অস্বীকার করেন, শেষোক্ত তিনজনের সাহিত্যিক বিচার না হয় ছেড়েই দিলুম।

শুধু চসরের সঙ্গে তুলনাটিই যদি তিনি আরো মনোযোগ দিয়ে চর্চা করতেন, তাহলে হয়তো ইংরেজি সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটে অধিকতর সুলভ জ্ঞানে বাংলার পটেও তিনি কল্পিত আরোপ থেকে বিরত হতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চসরের মুক্তি যেমন ইংরেজি কাব্যে একান্ত সত্য, তেমনি সত্য সে মুক্তির ফরাসী ইতালীয় আকাশ, যেমনি সত্য তার নির্বিরোধ গতানুগতিকের পরিগ্রহণ। আবার অন্তর্লীন ইংরেজি মেজাজের— গাওয়েন এণ্ড্ দি গ্রীন্ নাইট ও পার্লের লেখক বা ল্যাংল্যাণ্ড যার ব্যর্থ অর্থাৎ আংশিক কিন্তু প্রকৃত উদাহরণ— পরিপাকও তখন পরিণতির পথে অর্থাৎ চসরের প্রতিভার পক্ষে অনুকূল ও অন্যোন্যসম্পূরক। বুদ্ধদেববাবু চসরের এই সার্থকতা ও সীমার উভয়মুখিতা বিষয়ে একচক্ষু। ফলে তিনি ভাষাতত্ত্বেরও পক্ষে হাস্যকর উক্তি করে বসেন—

'Rabindranath is the most metaphorical writer in a highly metaphorical language······Bengali is partial to this habit of thought, but English, in spite of Shelley and Swinburne (!) is different, it is a level language, moving in logical sequences.'

অথচ তিনিই অন্যত্র বাংলায় ক্রিয়ার দুর্বলতা ও দারিদ্র্য আলোচনা করেছেন। তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে ইংরেজি ক্রিয়ার অফুরন্ত ঐশ্বর্যে ইংরেজিই

উৎপ্রেক্ষাময় ভাষা, চসর্-পূর্ব ইংরেজিতে সন্ধির অভ্যাস, প্যারালেলিসম্ ইত্যাদির প্রাচুর্যের ধারাও ইংরেজির উৎপ্রেক্ষাময়তার একটা কারণ। সম্ভবত বুদ্ধদেববাবু উৎপ্রেক্ষা ও উপমায় প্রভেদ দেখেন না, তাছাড়া ইতিহাস তাঁর হাতে কলের পুতুল মাত্র। তাই বাংলা গদ্যের বিষয়ে যে গদ্য প্রথম পৃষ্ঠায় দেখি রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করলেন তার বিষয়ে তিনি কাল ও পাত্রের পূর্বাপরহীন এই মন্তব্য করেন—

Midwifed by Rammohan Roy, nursed by Iswarchandra Vidyasagar, baptised so to say, by the morning memorable (as we say in Bengali) Serampore missionaries...'

সেইজন্যেই বোধহয় অবনীন্দ্রনাথের শিশুগল্প ও অন্যজাতীয় রচনার অসামান্য প্রতিভা যে বাংলা গদ্যে কি ঐশ্বর্য দিয়েছে, সে বিষয়ে তিনি অতর্কিত। অথচ ঐতিহাসিক মনোভঙ্গী বুদ্ধদেববাবু প্রকাশ করেছেন বারবার। তিনি ইংলণ্ড ও বাংলার সম্বন্ধনির্ণয়ে লেখেন—

Bengal alone, not the whole of India, nor any other part of it The rest of India, in those early days of disorder, was hostile, cold, crustaceous, only Bengal absorbed Europe with a speed and thoroughness that should be marked as a record in human relations'

তিনি সাম্রাজ্যপত্তনের এই দশের মধ্যে একের গভীর প্রেমের কারণও দেখিয়েছেন :

'The truth of the matter seems to be that the Bengali and the English, severe strangers in appearance have an inner *congenital affinity*...the minds of the *two peoples*, the Bengali and the English. moved to the same rhythmic pattern'

শেষের উক্তিটি বুদ্ধদেববাবু সজ্ঞানেই করেছেন নিশ্চয়ই, হয়তো তাঁর মতবাদ তাঁকে এই ইঙ্গবঙ্গীয় বিলাপে, ইংলণ্ডস্ ওয়ার্ক ইন ইণ্ডিয়া-র এই বিলম্বিত নবভাষ্যে প্রেরণা দিয়েছে। মতবাদের বিপদই এই, সেইজন্যেই তো মার্ক্স-এঙ্গেলস্ মতবাদের শূন্যচারিতা বা যান্ত্রিকতার প্রবণতার বিষয়ে ছিলেন অত তীক্ষ্ণদৃষ্টি। মতবাদঘটিত এবংবিধ স্বপ্নপ্রয়াণ অন্যত্রও দেখা যায়। যেমন কিছু-

কাল আগে অসামান্য কুশলী শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দেন যে তাঁদের সঙ্গে যোগ না দিলে নাকি প্রগতিশীল সাহিত্য রচনা অসম্ভব। মানিকবাবুদের কথাতেও দেখি এই স্বপ্লাঢ্য ধারণা, তফাত এই যে মানিকবাবুরা ভাবেন যে বাঙালী ও সোভিয়েট মন আজই একই ছন্দে চলেছে। ইতিহাস নিশ্চয়ই অন্য কথা বলে, মানিকবাবুও কি আর সজাগ মুহূর্তে জানেন না যে বাংলাদেশ ও সোভিয়েট ইউনিয়নে জীবন ঠিক এক নয় তথা সোভিয়েট সঙ্ঘ ও মানিকবাবুর সঙ্ঘও তুল্যমূল্য নয় ?

মতবাদের উগ্রতায় অবশ্য সত্যমিথ্যা হয়ে যায় একাকার, এঙ্গেল্‌সের আন্টি-ডুএরিঙের শেষ কথায় বাকি থাকে 'মেনট্যাল ইনকম্‌পিটেনস্‌ ডিউ টু মেগালো-ম্যানিয়া'। এ আত্মসর্বস্ব উগ্রতায় সাহিত্যবিচার তো ব্যাহত হবেই,

'As for the aesthetic side of education, Herr Duhring will have to fashion it all anew. The poetry of the past is worthless···Let him not tarry with it ! The economic commune can achieve the conquest of the world only when it comes in at the double in Alexandrine rhythm, reconciled with reason.'

এবং এ উগ্রতার তাল কখনো ডাইনে কখনো বামে। মিলটা এখানে কম নয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত হাকিমের কাজ করেন এ নিয়ে মানিকবাবু যেমন তাঁর ড্যুএরিঙ্গীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে যৌনবিকার বিষয়ে এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক ও অশোভন আলাপ করেছেন, তেমনি বুদ্ধদেববাবু লিখেছেন যে, অচিন্ত্যবাবুর সাহিত্য-বিচারে একটা ত্রুটি দ্রষ্টব্য— 'দি ওব্‌লিগেশন্‌স্‌ অব এ গভর্নমেণ্ট অ্যাপয়ণ্টমেণ্ট', যার জন্যে তাঁকে মফস্বলে থাকতে হয়। বুদ্ধদেববাবু মানিকবাবুর বিষয়েও লিখেছেন — স্বল্পকায় বইয়ের পক্ষে সমধিক মাত্রায়, পুরো দু-পৃষ্ঠা ধরে—

'Like the great quantities of verse and fiction (if we must call them so,) being written in Bengal at the moment merely to illustrate some particular political doctrine.'

মানিকবাবুর গত কয়বছরের রচনাবলী নাকি ভীষণ বিকৃত! মানিকবাবু নাকি আজকাল নিউরটিক ও সেক্‌সুয়াল পারভার্টস্‌ ছাড়া আর লেখেনই না। এ ভাইরস মানিকবাবু প্রতিভাবলে দূর করবেন, বুদ্ধদেববাবু নাকি এ আশা করেছিলেন কিন্তু মানিকবাবু বোধহয় 'প্রিডিসপোসড্‌ টু দি ডিস্‌ঈজ্‌' ইত্যাদি এবং উপসংহারে।

'Now it is a maniac instead of a moron, libertine instead of a lout, criminality instead of imbecility…'

যে উগ্রতায় মানিকবাবুর বিষয়ে এই নির্বিচার উষ্মা সেটা নিছক সাহিত্যিক ভাবতে বিশ্বাস হয় না। এই উগ্রতার জন্যেই বোধহয় বুদ্ধদেববাবুর নাতিহ্রস্ব কবিদের তালিকায় অরুণ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলা চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য বাতিল? যেমন গল্পের তালিকায় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রমেশ সেন, নরেন্দ্র মিত্র, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা প্রভৃতি অপাঙ্‌ক্তেয় কিংবা নাটকে বিজন ভট্টাচার্যের নাম অনুচ্চার্য। সেই জন্যেই কি জ্যোতির্ময় রায়ের গল্পের বিষয়ে তিনি দুটি শব্দ 'ব্লান্ট্‌ ভিগার' পেলেন এবং তাঁর হালকা প্রবন্ধের বিশিষ্ট স্থান উল্লেখই করলেন না? তাই কি বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামাবলীতে স্থান পান নি?

এই যে দলীয় বা রাজনীতিগত রোষতুষ্ট জাতিবিচার এ বুদ্ধদেববাবু কি করে তথাকথিত বামপন্থী সমালোচনার প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করেন? তবে তথ্যের উপরে অবজ্ঞা তাঁর মধ্যে মধ্যে মানিকবাবুর মতোই প্রবল। মানিকবাবুর পক্ষে লিখতে কোনই দ্বিধা হয় নি যে অচিন্ত্যকুমারের কলম নাকি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল মধ্যে, তারপরে হাকিমীর আকস্মিকে পূর্ববঙ্গে গিয়েই নাকি তাঁর কলম গেল খুলে। বুদ্ধদেববাবুও অনুরূপ উদ্ভাবনীশক্তির নমুনা দিয়েছেন। মানিকবাবু যেমন তাঁর কল্পিত প্রতিপক্ষের গোর্কিবিষয়ক বুর্জোয়া বাক্য সম্পূর্ণভাবে, দুর্নীতিমূলকভাবে বিকৃত করে তাকে উদ্ধৃতির চেহারা দিতে পারেন, বুদ্ধদেববাবুও প্রায় তেমনি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে আজকাল কবিতা লেখেন না, তার কারণ তাঁর বিশেষ রাজনীতি, একথা অম্লানমুখে লিখতে পারেন— যদিও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কয় বছরের নীরবতার বিষয়ে তিনি শোভনভাবেই নীরব।

এই দুই উগ্র মতবাদই সাহিত্যের স্বাধীনতার প্রতিকূল। হয়তো এসব মতবাদ 'মতবাদ' মাত্র, ব্যক্তিগত রুচি-অভিরুচি বন্ধুত্ব বা দলাদলির ভাবকল্পলীলা বা পরলোকিকতত্ত্ব। যে বৃহৎ অর্থে সমাজ সাহিত্যে বিবেচ্য সে সম্পূর্ণতা যেমন এসব লীলায় দুর্লভ, তেমনি ব্যক্তিগত খবরের চুটকি এখানে অহেতুক মূল্য পায়।

আশা করি বুদ্ধদেববাবু উপরের বিনীত নিবেদনে ভুল বুঝবেন না। আমি জানি তাঁর শিল্পপ্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা, তবু যে সামান্য বক্তব্য বলতে পারলুম, সে সাহসের কারণ তিনি আর প্রেরণায় বিশ্বাস করেন না। আমার ভরসা তাঁরই কথা:

'nothing remains for us but hard work, the discipline of selfconsciousness

বলাই বাহুল্য, এতদিন পরে বুদ্ধদেববাবুর এ কথায় বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী মাত্রেই আনন্দিতই হবেন, যেমন হবেন মানিকবাবুর মত পরিবর্তনেও। মানিকবাবুও সম্প্রতি মনে করেন না যে অন্যের বই পাঠে স্বকীয়তা নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য তাঁর এ ধারণাও হয়েছে যে আমাদের এই শতকরা পাঁচজন সাহিত্য-পাঠকের দেশে অসহায় জনগণ নামক এবস্ট্রাকশন শুধু তাঁর ও তাঁর সঙ্ঘবদ্ধ বন্ধুদের সম্পত্তি।

বুদ্ধদেববাবু কিন্তু এই বইয়ে কঠিন পরিশ্রম বিশেষ করেছেন বলে মনে হয় না, এবং যে আত্মসচেতনতায় তিনি অনন্যবোধে কাতর, সে আত্মসচেতনতার কথা নিশ্চয়ই মারিত্যাঁ পিকাসোর বিষয়ে বা এলিঅট আধুনিক কাব্যের প্রসঙ্গে বলেন নি। যে বয়সে অমিত রায়কে মনে হয় আদর্শ, এ আত্মসচেতনতা কি সেই বয়সেরই নয়? বুদ্ধদেববাবু তাই মনে হয় কৈশোরক কিন্তু অকপট উচ্ছ্বাসে অনেক সময়েই কষ্ট করে তথ্যসংগ্রহ না করে বা পাতা না উল্টেই তাঁর নিজের স্মৃতিশক্তির উপরে নির্ভর করেছেন তথ্যান্মোচনে। তাঁর বাক্যরচনা ও শব্দ-ব্যবহারও সময়ে সময়ে অসতর্ক ও অস্পষ্ট।

ইংরেজি ও বাংলা গীতাঞ্জলির তফাত দেখিয়ে বুদ্ধদেববাবুর আলোচনা উৎকৃষ্ট তুলনামূলক সমালোচনা হতে হতেও তাই হল না, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও বাংলার তফাত দেখাতে বুদ্ধদেববাবু নিজে আবার যথাযথ অনুবাদ দিয়েছেন। কিন্তু শ্রাবণ ঘন গহন-মোহে গানের 'নিলাজ নীল' কি ঠিক 'ইংমডেস্ট্ ব্লু'? নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে— কি

'Have hope, O my heart, hope day and night, for it will be, it will be'?

কিংবা 'মাধুর্যের মালা' কি 'গার্ল্যাণ্ড অব্ সুইটনেস্'? তিনি মিষ্টির অনুরাগী কিন্তু মাধুর্য কি বরঞ্চ 'গ্রেস্'এর আত্মীয় নয় বা মাধুর্যের মালা 'এ টেনডার গার্ল্যাণ্ড'। তাঁর মন্তব্যে বুদ্ধদেববাবু লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথের নিজের অনুবাদে 'স্বর্ণথালা' হয়েছে 'গোল্ডেন বাসকেট' এবং এ উন্নতির বুদ্ধদেবদত্ত কারণটি অদ্ভুত:

'Basket is a better visual image than the garland on the plate.'

—তাই কি? বাজারের বাস্কেট, টিফিনবাস্কেট, ফলের বাস্কেট, ফুলের বাস্কেট, কি সঠিক ইমেজ কিছু? তাছাড়া 'গার্ল্যাণ্ড অন দি প্লেট' এল কোথা থেকে?

'সেথা উষা ডান হাতে ধরি স্বর্ণথালা, নিয়ে আসে একখানি মাধুর্যের মালা'— ইমেজটি তো সোনার থালা উষার ডান হাতে। কিন্তু সবচেয়ে মজার বুদ্ধদেব-বাবুর ইংরেজি উৎকর্ষের বিষয়ে এই মন্তব্য : 'রাইটহ্যাণ্ড সাউণ্ডস বেটার দ্যান হ্যাট'— ইংরেজিপ্রীতির এ মাত্রা কি এলিঅট কথিত 'আইসোলেটেড সুপিরিঅরিটি'-র এদেশী সাধনার অঙ্গ?

তাছাড়া কেন যে বুদ্ধদেববাবু ইংরেজি মেঘকে, আষাঢ় বা আশ্বিন নয়, শুধু বাংলা শ্রাবণের মেঘের সঙ্গে তুলনা করে বলেন যে, I wandered lonely as a cloud বা bring fresh showers for thirsting flowers (the thirsting flowers নিশ্চয়ই?)— বাংলা বর্ষার কাব্য হতে পারে না, তাও বোঝা শক্ত। অনুবাদতত্ত্ব আলোচনায় তিনি ঠিকই বলেছেন যে মাইনর কবিতা অনুবাদ্য, দুঃখ করেছেন যে 'দি ইণ্ডিয়ান সেরিনেড' ও 'ল বেল দাম্ সাঁ মেরসি'র বাংলা অনুবাদ বালালোল মাত্র, কিন্তু তারপরেই যখন তিনি একনিশ্বাসে বলেন :

We have, however, very good translation from Heine, Hugo, Stevenson. D. H. Lawrence, from Noguchi and Chinese Anthology (!)

তখন নামগুলির অসম্বদ্ধ পারম্পর্য, মাইনর কবি পঙ্‌ক্তিতে লরেন্স, হাইনে ও হুগোর নামগুলি অবাক করে।

কিন্তু এসব কথায় বুদ্ধদেববাবুর প্রাদেশিকতা প্রমাণ নয়, শুধু সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার উদ্দেশ্য। এখানে বুদ্ধদেববাবুর বইটি আমি উপস্থিত করেছি আমাদের সাহিত্যিক সমস্যার একটি উদাহরণ, একটি জলে-কুমীর হিসাবেই। বলা বাহুল্য, তাঁর সঙ্গে বহু বিষয়ে অন্যেও একমত হবেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও গদ্য বিষয়ে যে বুদ্ধদেববাবু এতকাল পরে যে কারণেই হোক তাঁর অনীহা ও অশ্রদ্ধা দূর করতে পেরেছেন, তাতে আমরা খুশি। বা ছকে ফেলে সাহিত্যরচনার মারাত্মক অভ্যাসের বিরুদ্ধে বা যান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সমালোচনার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদও আমাদের সশ্রদ্ধ বিবেচনার যোগ্য। কিন্তু তাঁরও মতবাদ আছে, প্রচ্ছন্ন রাজনীতি আছে— এবং সেইখানেই তাঁর

সমালোচকদের ভাণ্ডারে বাঘেদের সমর্থন জোগান। আঁদ্রে জিদের ভাষায়, বুদ্ধদেববাবু জিদের কথায় ক্ষুব্ধ হতে পারেন না বলেই, বলা যায় :

'Leon Plum's thought has lost all interest for me, it has merely become a subtle instrument that he lends to the demands of his cause.' (*Journals, I*)

অথচ বুদ্ধদেববাবু তাঁর কজ্ বা এই সটল্ ইনস্ট্রুমেণ্ট ব্যবহারেও যথেষ্ট অবহিত নন। নাগরিক উচ্চশিক্ষার অভিমানে তিনি উচ্চকিত। অচিন্ত্যকুমার চাকরি ব্যপদেশে কলকাতায় থাকতে পারেন না এই ভেবে তাঁর করুণা অশ্রুময়, নজরুল ইস্‌লাম নাকি অপরিণত চিরকিশোর এ আলোচনায় তাঁর কণ্ঠস্বরের পরকীয় গাম্ভীর্য প্রায় এলিঅটের চেয়েও বেশি ইংরেজি প্রাপ্তবয়স্ক। এবং তারাশঙ্কর যে কী পরিমাণে প্রাদেশিকতাদুষ্ট, নাগরিক বৈদগ্ধ্যহীন— কারণ তিনি বুদ্ধদেববাবুর মতো হয়তো কলকাতায় এসে কলকাতাকে উপজীব্য করেন না তাঁর গল্পোপন্যাসে, যদিচ তাঁর একটি সাধারণ উপন্যাস 'মন্বন্তর'-এই কলকাতার পাড়ার যে প্রত্যক্ষ আবহাওয়া ফুটেছে, তা কলকাতামার্কা সাহিত্যে দুর্লভ— সে বিজয়ী আবিষ্কারে বুদ্ধদেববাবু হিরণ সান্যালের মতোই মাত্রা হারান। তারাশঙ্করের কোনো সরল চরিত্র নাকি একবার কাসাবিয়াঙ্কার মতো গ্রাম্য-কবিতা আবৃত্তি করে ফেলেছে! প্রথমত জীবনানুগতার দিক থেকে এটা খুবই যথাযথ, যে দেশে হাইনে হুগো স্টীভনশন্ নোগুচি সমোচ্চার্য সেই দেশে বিশেষ করে। তাছাড়া বুদ্ধদেববাবুর তুলনায় এ মতানুসারে রবীন্দ্রনাথও ঘোর অশিক্ষিত, কারণ 'গোরা'য় তাঁর চরিত্র আবৃত্তি করেছে 'লাইফ ইজ্ রিয়াল, লাইফ ইজ্ আরনেস্ট' ইত্যাদি, এমন-কি তার বাংলাও দেওয়া আছে। তার উপরে বুদ্ধদেববাবুর মৌল আবিষ্কার হচ্ছে যে তারাশঙ্করের গল্পোপন্যাসে নাকি নরনারীর প্রেম একেবারে নেই। তারাশঙ্করের ত্রুটি নিশ্চয়ই তাঁর রচনাশৈথিল্য, শিল্পের চেয়ে জীবনের স্রোতেই গা ভাসানোয়, কিন্তু তাঁর জীবনের একটা নির্বিচার হলেও বৃহৎ বোধ অনস্বীকার্য। অন্য সাহিত্যিকসাধারণের সঙ্গে সামান্য একাত্মবোধ থাকলেও বুদ্ধদেববাবু সেটা মানতেন! কিন্তু বুদ্ধদেববাবু মূলত একেশ্বরবাদী, সেই সোহং-হেগেলের গল্পের মতো, যদিচ তিনি থেকে থেকে দশাবতারকেও নামান— অন্তত নয়, সাড়ে নয়জনকে।

প্রত্যক্ষ জীবনের যে একাত্ম বিন্যাসে ও কিছুটা হয়তো রাশ্যান জীবনধারায় স্টালিনের কথা রাশ্যায় সার্থক, সেই আত্মপক্ষে সমালোচনার রীতি যে মুক্তিরই

এক পরিবর্তনীয় সীমান্ত, সে স্বাধীনতা বুদ্ধদেববাবুর আজ কল্পনাতীত, তাঁর সমালোচনা তাই বৈরী বিধর্মীকে ছায়াময় আক্রমণ মাত্র। সেইরকমই কয়েক বছর ধরে, 'পরিচয়' ও কয়েকজন প্রগতি লেখকদের মধ্যে মাঝে মাঝে যে অসহিষ্ণু দলীয়তা দেখে এসেছি, তার যতই দার্শনিক সমর্থন তাঁরা করে থাকুন সেও একটা লাসালী ভ্রম : তাঁরাই নাকি জনসাধারণ, তাঁরাই প্রগতি, আর সবাই এক বিরাট প্রতিক্রিয়াশীল পিণ্ড। গটা-প্রোগ্রামের সমালোচনায় এ ভ্রান্তি স্বচ্ছ হয়ে যায়। এঙ্গেলস্‌ও লেখেন :

'The real weakness is the childish notion of the coming revolution which is supposed to begin by the whole world dividing itself into armies ; we here, the 'one reactionary mass' there. That means that the revolution has to begin with the *fifth act* and not with the first.'

লেনিনের কথায়

'To imagine that means repudiating social revolution... whoever expects a "pure" social revolution will never live to see it. Such a person pays lipservice to revolution.'

আমাদের কোনো কোনো বামপন্থী সমালোচনা পড়েই তাই মনে হয় মার্কসের কথা :

'For a theatrically vain nature like Lasalle it was a most tempting thought : an act directly on behalf of the proletariat and executed by Ferdinand Lasalle.'

বিশেষ করে এ সতর্কবাণী প্রযোজ্য শিল্পসাহিত্যে, কারণ প্রথমত শিল্পসাহিত্যের নিজস্ব ইতিহাস একেবারে ভুলে বৃহত্তর ইতিহাসের নামে এক কল্পিত ছকে ফেলবার প্রবণতা আমাদের সহজ। আর দ্বিতীয়ত আমরা ভুলে যাই যে সাহিত্যশিল্পের বৈশিষ্ট্যই হল যে স্তরে জীবনের রূপান্তর, সে রূপান্তরের স্তরে অনেক সময়ে এসে যায় আপাতবৈপরীত্য। বালজাকের প্রতিক্রিয়াশীল মতামত এবং তাঁরই সাহিত্যসৃষ্টিতে তার গভীরতর খণ্ডন তাই মার্কসিস্‌মের পুরোধাই দেখান। ছোট ক্ষেত্রে নেমে এলেও আমরা এ সত্যের প্রমাণ পাই, যেমন এলিঅটের জীবনবিতৃষ্ণ অস্পষ্ট মতামত প্রকাশ পায় যে নিহিত ছন্দে, তা

একরকম জীবনেরই অঙ্গীকারের স্পষ্ট ছন্দ। শেক্‌সপীয়রের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব মহত্ত্ব লাভ করেছিল, তার বিচার নানা দিক থেকে অনেক সমালোচক করেছেন; মধ্যযুগের দায়ভাগও তাঁর উপরে বড় কম ছিল না। চসরের কাব্যের প্রগতি ও জীবনদর্শনের প্রথাগত সামান্যতা এবং ল্যাংল্যাণ্ডের কাব্যের পশ্চাদ্‌গতি ও জীবনদর্শনের চাষীবিদ্রোহমূলক প্রগতিশীলতার দ্বন্দ্বও এই রূপান্তরের স্তবপর্যায়েই বিবেচ্য। এইখানেই পরিশ্রমের, তথ্যানুসন্ধানের প্রশ্ন, এইজন্যেই শিল্পসাহিত্যের সমাজতান্ত্রিক বিচার জটিল। এ বিচারে সরলীকরণের চেষ্টা স্বাভাবিক, কল্পনা-বিলাসের আশ্রয়ও হয়তো তাই নিতে হয়। টমাস মানের সঙ্গে রম্যাঁ রলাঁর তুলনায় তাই বোধহয় বলতে ইচ্ছা করে বলাঁর (ব্যক্তিগতরুচিসাপেক্ষ) শ্রেষ্ঠতরতার কথা, এমন-কি রলাঁকে কম্যুনিস্ট্ আখ্যা দেওয়া হয় তার প্রমাণ হিসাবে, যদিও রলাঁর বিষয়ে যে কথাটা সত্য নয়, তার সাক্ষ্য লা পঁসে-তে মল্লাঁ-র ঐ বিষয়ে প্রবন্ধটি। গোর্কির বিষয়েও এই রকম, তিনি কম্যুনিস্ট এ বিশ্বাসঘটিত ভ্রান্ত ধারণা যুক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সাহিত্যের দিকে এরকম মতামতে ক্ষতিই হয়, রচনার ও পাঠের রুচির মান এতে নীচেই নামানো হয়। কারণ এ মনোভাব শুধু বিদেশী মহাজনেই আবদ্ধ থাকে না। সাহিত্য যে 'লেজিসলেটবস্ অব ম্যানকাইণ্ড' এ আদর্শবাদেরই জোরে এঁরা মনে করেন যে সমালোচকেরা 'লেজিসলেটবস্ অব লিটরেচর' এবং বাংলা সাহিত্যেব ক্ষুদ্র কমলবনেও এঁরা হানা দিয়ে বেড়ান। এইদিক থেকেই সুকান্ত-কাব্য সম্বন্ধে সঙ্ঘবদ্ধ অতিকথন অনর্থদুষ্ট, প্রায় প্রতিপক্ষ বুদ্ধদেববাবুব অতিকথনেরই মতো: সুকান্ত-কাব্যকে পাঁচ নম্বর না হয় ছয় নম্বর দেবেন সে বিষয়ে কবিতা-পত্রে বুদ্ধদেববাবু ঘোর দুশ্চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, এবং সে ঐশ্বরিক চিন্তার শেষে তাঁর ইংরেজি বইটিতে তাই সুকান্তর উল্লেখই করেন নি। তারাশঙ্করের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথার' সমালোচনায় তাই নীতিসম্পন্ন নাক কুঞ্চিত হয়ে ওঠে 'রঙের' ব্যাপার দেখে, তারপরে সমালোচককে জাতীয় জীবন নামক বস্তুর মনগড়া ছবিতে সংখ্যাতত্ত্বেব খেয়ালী ব্যাখ্যায় বলতে হয় যে কাহার-রা যেহেতু সংখ্যায় কম, সেহেতু তাদের গল্পজাতীয় সাহিত্য হতে পারে না, যেমনটি হতে পারে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (বলাই বাহুল্য, মানিকবাবুর চমৎকার সুলিখিত উপন্যাস)। কাহার-রা নাকি শুধু হতে পারে ভেরিঅর্ এল্‌উইনের নৃতত্ত্বের রসালো বিষয়। ভারতবর্ষে এই জাতীয়বাদী সমালোচনা! যেখানে কোটি-কোটি লোক ভদ্রলোক হতে পারে নি, ইংরেজি শেখে নি, ইংরেজি-

শিক্ষিতের সামাজিক বা ধর্ম আন্দোলনে অংশ পায় নি। নৃতত্ত্ব-বিষয়ে ভ্রান্তি-বিলাস না হয় মার্জনীয়ই মানলুম।

কিন্তু ব্যাপারটা ঠাট্টার বিষয় নয়। সমালোচনার মান-বিকার সাহিত্যের এবং কিছুটা জীবনের পরিধিতে ব্যাপ্ত। প্রেরণাবাদের অভ্যাসিকতা এই আলাদীনের ম্যাজিকযন্ত্রচালিত প্রদীপোজ্জ্বল স্বপ্নময় স্বর্গরাজ্যবাদেরও বর্তমান। শেষোক্ত ধর্মও 'সমাজের ভাবী গঠন বিষয়ে একরকমের কল্পনার খেলা'— কারণ

'Naturally Utopianism which before the time of materialist critical socialism concealed the germs of the latter within itself, coming now after the event can only be silly; *silly, stale* and basically reactionary.' (*Engels*)

অর্গ্যানিক প্রকৃতির প্রক্রিয়াবিশেষের উপরে যন্ত্রবিজ্ঞানের পদ্ধতির প্রয়োগে কি বিপদ, 'ফয়েরবাখে' তা সুস্পষ্ট দেখানো হয়েছে। অথচ আমাদের সমালোচকেরা প্রায়ই উদোর পিণ্ডি চাপান বুদোর ঘাড়ে, কবিতায় চান গল্প, গল্পে চান সংবাদ, রাজনীতির কর্মক্ষেত্রের বিবেচ্য করেন প্রাথমিক দাবি গল্প-বিচারে, অর্থনীতির তত্ত্বের বর্ষফল খোঁজেন কাব্যের মিলে, আমাদের সমাজের জীবনের মনোলোল্যে খোজেন সোভিয়েট সমাজেব প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা। বলাই বাহুল্য মার্ক্সবাদে এই সহজ পথের সমর্থন নেই,

'because no philosophy recognises the emergence of levels of organisation better than dialectical materialism, and the individuals of which the human social collectivity is built up are themselves the most complicated organisms in the living world.'

শিল্পসাহিত্য রচনায় আজও তাই ব্যক্তিরচয়িতাই প্রাথমিক, এই অনেক মানুষের পথে তাই আজও ওঅন-ওয়ে-ট্রাফিকের নিয়ম চলে না— কি দক্ষিণে, কি বামে।

অধিকন্তু, শিল্পসাহিত্যে— যেখানে মানসজীবন মূলত আর্থিক সামাজিক ও জৈব অবস্থানিচয়ের রূপান্তর হলেও খানিকটা আবার স্বতঃই নিয়ন্ত্রণ ও চালনা-শক্তি পায় (গারোদি : সমাজতন্ত্রবাদ ও মানসনীতি : **organisateur et moteur**), সেখানে তাই স্তরগত সত্তাকে অস্বীকার শিল্পসৃষ্টি বা রচনার

পরিপন্থী। মানিকবাবু যদি বলেন, তাঁর সজ্ঞের বাইরে এই নিয়ন্ত্রণের স্তর অগোচর, তাহলে তাঁর পুনর্বাদ হয়ে দাঁড়ায় বিজ্ঞানবহির্ভূত, মরমীয়া।

'of an obscurantist character, since it was supposed that the organising relations were themselves the anima and as such inscrutable to scientific analysis.'

বিশেষত বিজ্ঞান তথা সমালোচনার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ঐ বিশেষ স্তরের প্রক্রিয়ায় যে বিশেষ ফর্ম, তাই পর্যবেক্ষণ করা। অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্যে আছে বৃহত্তর সম্বন্ধের ঐক্য কিন্তু তার প্রকাশ হয়

'in qualitatively different forms of whose distinctive characters one should never lose sight of.'

এবং ফর্ম ও ম্যাটার সমতুল্য বা অভিন্ন (ডায়ালেক্‌টিক্স অফ নেচার)। এই পর্যবেক্ষণে, এই অভিন্নতার বিচারে অবশ্যই ফর্ম বাধ্যত খানিকটা পরোক্ষ নিদান হয়ে দাঁড়ায়, কারণ ফর্মের পরিবর্তনের জ্ঞান সম্ভব ফর্মের প্রাথমিক জ্ঞানে এবং তার উৎসের জ্ঞানেই। এবং এ পরিবর্তন তো নিত্য ও সর্বব্যাপী, পুরাতন ও নতুনের, জীর্ণ ও নবজাতকের দোহারই বিবর্তনের প্রক্রিয়ার অন্তর্লীন আতত বিষয়বস্তু। এঙ্গেলস্‌ তাই লেখেন :

'We all, that is to say, laid and were bound to lay the main emphasis at first on the derivation of political juridical and other ideological notions from basic economic facts. But in so doing we neglected the formal side—*the way in which these notions come about*, for the sake of the content.'

নন্দনতত্ত্বে বা শিল্পসাহিত্য বিচারে শেষোক্তটিই মুখ্য বিচার।

'It is the old story : form is always neglected at first for content. As I say, I have done that too, and the mistake has always struck me later.'

এই ন্যায়বিশ্বের আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসন বা এই স্তরের ভিন্নতার উপরে নজর দেবার প্রয়োজন মার্কস্‌ তাই বিবৃত করেন ক্রিটিক্‌ অফ্‌ পলিটিক্যাল ইকনমির ভূমিকায়। আইডিওলজিক্যাল ফর্মগুলিকে উৎপাদনের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন তিনি বলেন নি, বলেন 'রূপান্তর'। তিনি বলেন যে আমাদের

ভাবজগৎ, চিন্তাজগতের সূত্রপাত 'প্রথমে' বাস্তব কর্মপদ্ধতি ও মানুষের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে জড়িত (জর্মান আইডিওলজি)। আবার

'From the start the "spirit" is afflicted with the curse of being "burdened" with matter which here makes its appearance in the form of agitated layers of air, sounds, in short, of language.'

কর্মের তাগিদে বা কর্মীর আত্মপ্রসাদে আমরা ভাষার এই উভয়মুখিতা ছাঁটাই করি, ভাষাকে সঙ্ঘবদ্ধ হাতুড়ি ভেবে ফেলি কিংবা ঐ 'আত্মা'কে বা মানসকে হুকুম দিই প্রত্যক্ষ বাস্তবতাকে মাটিতে ফেলে সাম্যবাদী সমাজের রিয়ালিসমের আকাশে উড্ডীন হতে। শিল্পসাহিত্যেরও যে একটা ইতিহাস আছে, একটা বেগতত্ত্বও আছে, তা আদর্শবাদীর আবেগে ভোলা স্বাভাবিক নিশ্চয়ই। কিন্তু স্রষ্টাশিল্পের কর্ম ঠিক সিস্‌টেম বা মেটাফিসিকস্‌ তো নয়, প্রতিষ্ঠান বা যন্ত্রও নয়— শিল্পীদের সঙ্ঘ অবশ্যই তা হতে পারে। নৈঃসঙ্গ্যের অসংলগ্ন চর্চাও সমানই অসহিষ্ণুতার লক্ষণ। কারণ তাতেও সরলীকরণ, তাতেও ব্যক্তিসমাজের প্রাণময় আততি অস্বীকৃত— অধিকন্তু অবশ্য তাতে আশুপ্রয়োজন সামাজিক উন্নতি অস্বীকৃত।

তাছাড়া শিল্পকর্ম যে এখনও কিছুটা আদিম, সে কথা ভুললে চলে কি করে, বিশেষ করে প্রাথমিক শিল্পগুলি এবং বিশেষ করে আমাদের সমাজজীবনে। সিনেমা, বালে, নাট্যমঞ্চ ও পোস্টার ছাড়া যৌথ শিল্প কই আর? অধিকাংশ আদিম শিল্প যথা সাহিত্য বা স্টুডিওচিত্র আজও ব্যক্তির হাতে গড়া,

and therefore of necessity, small, dwarfish, circumscribed. But for this very reason, they belonged as a rule to the producer himself.

তাই এখনো শিল্পকে, এই ইন্দ্রিয়গত মানবিক কর্মপ্রক্রিয়াকে শুধুই যৌথ সামাজিক পণ্যদ্রব্য ভাবাটা মার্কস্‌বাদের পরিপন্থী। সেইজন্যেই ফরাসী কম্যুনিস্ট নেতা এরভে ও গারোদি বলেন যে শিল্পবিচারে কোনো পার্টিলাইন বা মার্কসীয় নিয়মকানুন প্রযোজ্য নয়। মার্কস্‌ কারুশিল্পী বিষয়ে যা লেখেন, তাও এ প্রসঙ্গে তুলনায় চিন্তনীয়—

'There is found with mediaeval craftsmen an interest in their special work and in their proficiency in it which was

capable of rising to a narrow artistic sense. For this very reason, however, every mediaeval craftsman was completely absorbed in his work···and to which he was subjected to a far greater extent than the modern worker, whose work is a matter of indifference to him.

এই দৃষ্টিতে একদিকে বুদ্ধদেবের 'ইন্‌কোরাপ্‌টিব্‌ল্‌ রোল্‌ অব দি পোয়েট'-এর বিলাস অর্থহীন, অন্যদিকে স্বয়ম্ভর তথাকথিত মার্কস্‌বাদীর ফাঁকিও মারাত্মক হয়ে ওঠে। তাঁরা কেউ কেউ দ্রুত সমাধানের তাগিদে আরম্ভ করেন বর্জন-নীতি। সামাজিক সম্বন্ধপাতে এবং উৎপাদন শক্তিসমূহে বিরোধিতা লক্ষ্য করে তাঁরা আধুনিক শিল্পসাহিত্যকে বিসর্জন দিয়ে একবার কাঁদেন মানবসমাজের প্রথম সারল্যের দিকে ফিরে, একবার হাহুতাশ করেন ভাবীস্বপ্নের সুখময় কোলে—

'this antagonism between the productive forces and the social relations of our epoch is a fact. Some may wail over it, others may wish to get rid of modern arts, in order to get rid of modern conflicts.' (*Engels*)

মার্কস্‌ও মন্তব্য করেন এই অসমতার বিষয়ে তাঁর ক্রিটিক্‌ অব পলিটিক্যাল ইকনমির ভূমিকায়। অধিকন্তু,

'As to the realms of ideology which soar still higher in the air, religion, philosophy etc., these have a prehistoric stock.'

সুতরাং

'All one can reasonably do, however, is (1) to try to discover the method of division to be used *at the beginning* and (2) to try to find *the general tendency* in which the further development will proceed.'

এবং তার জন্যে

'all history must be studied *afresh,* the conditions of existence of the different formations of society must be individually examined.'

এবং সাহিত্যবিচারে তাই যেমন সাহিত্যবস্তুই প্রধান বিবেচ্য—কে হাকিম বা হাকিমপুত্র, কার চরিত্র কি রকম সে শুধু পরে এবং জীবনীর স্তরেই বিবেচ্য —তেমনি ঐ ব্যাপক ও গভীর সমাজেতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেতিহাসও গ্রাহ্য—সাহিত্যবিচারে।

অবশ্য এসব কথার জবাবও তিনি সহজেই দিতে পারেন তথাকথিত মার্ক্সিস্‌মের জাদুকাঠি যাঁর হাতে। চরম সত্য এবং একমাত্র নিখুঁত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিশক্তি তাঁদের মুঠিতে যাঁদের বিশ্বাস, তাঁদের পক্ষে অবজ্ঞা ও বর্জননীতি স্বাভাবিক—হের্‌ ডুএরিঙের মতোই। তাছাড়া

'as in economics it is assumed that every consumer is a real specialist on all the commodities he has occasion to buy for his maintenance—so similar assumptions are now to be made in science.'

এঙ্গেলস্‌ এই মনোবৃত্তিকে বলেছেন শিশুরোগ। হাঁ-বা-না মার্কা ধর্মপরায়ণ এই ব্যক্তিদের কাছে স্বকীয় ইতি-ও-নেতির বাইরে সব কিছুই মন্দ, পাপবিদ্ধ, প্রতিক্রিয়াশীল, এমন-কি 'ফ্যাসিবাদী'ও। তাঁরা ভুলে যান তাঁদের একেশ্বরাবেগে যে দ্বন্দ্ব ও স্তরের বিভেদগুলির মূল্য আপেক্ষিক, যে তাঁদের কল্পিত ভাগাভাগির কাঠিন্য এবং এক ও অদ্বিতীয় পুরুষার্থ তাঁদেরই মানসিক দান এবং একথা ভুললে ডায়ালেক্‌টিক্স অচল।

এরকম বিস্মরণে বিপদ খুব বেশি, অন্তত আমাদের তাই বিবেচ্য, শিল্প-সাহিত্যে। রীতিমত ধর্মেতিহাসেও দেখা যায় যে ঈশ্বরকে আত্মা বা সর্বস্বদানের চরম পরিণতি হচ্ছে অবাঙ্‌মনসোগোচরের যে অতীন্দ্রিয়তা, তাতে শিল্পসাহিত্যে যে গোচরেরই জয়গান তা বিধর্মের নামান্তর। যে পরিমাণে গির্জা বা মন্দির-শিল্প ঐহিক, যে পরিমাণে কৈবল্যে আত্মদান অসম্পূর্ণ, সেই পরিমাণেই সেই শিল্পের প্রাণৈশ্বর্য, সেই সাহিত্যের প্রত্যক্ষ জীবনের উৎসে বারংবার প্রাণসংগ্রহ। রবীন্দ্ররচনাবলীতে আমরা এই দ্বৈতাদ্বৈতের আশ্চর্য সুন্দর প্রকাশ পাই।

পরোক্ষ মার্গে জীবনাভিজ্ঞাঘটিত কোনো ঈস্‌থেটিক বা সংবেদ্য কর্মচর্চা ঐতিহাসিক বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়, এমন-কি শিল্পবস্তুবিশেষের উৎকর্ষ ও হয়তো তাতে তুলনায় ক্ষতিগ্রস্ত। তাই তো এঙ্গেলস্‌ লেখেন যে যবের চারা ও আনন্তিক কলন দুইই নেতির নেতিকরণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এ জ্ঞান থাকলেও যবের চাষ বা অঙ্কের উত্তর সঠিক হয় না, তারের স্থূলতার পরিমাণে শব্দের

ওজন কি তা জানলেও হয় না বেহালা বাজাবার ক্ষমতা। তাছাড়া চিরসত্য হয়তো অঙ্কে প্রযোজ্য কিন্তু ইতিহাসে বা জীবনের অভিজ্ঞায় সত্যকে হতে হয় বারবার আবিষ্কারে প্রত্যক্ষে প্রতিভাত। মানুষের ইতিহাসে যেমন কয়েকটা মোটা পুরুষার্থ প্রায় চরম মূল্য পেয়ে গেছে তেমনি আবার সে পুরুষার্থের বিশেষ রূপ ও প্রয়োগ কালনির্ভর—যদিও মানবিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান জীববিদ্যার চেয়েও পিছিয়ে আছে (এঙ্গেলস্)।

সাহিত্যের পক্ষে আর একটা গৌণ বিপদ হচ্ছে এই জীবনে পুরুষার্থজড়িত ভাববিলাস। ভাববিলাস সর্বদাই বিপজ্জনক, অসংহত কল্পিত নৈঃসঙ্গ্যে বা শিল্পরচনার প্রয়োজনীয় অবকাশ বা নৈঃসঙ্গ্যহীন সঙ্ঘে যেখানেই হোক, কিন্তু তার বিপদ আরো বেশি, যখন তার পিছনে বিজ্ঞানের ছাপমারা সমর্থনের রং চড়ে। উদাহরণত সাহিত্যের একটা বড় উপজীব্য প্রেমই ধরা যাক। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর আলোচনা মনে পড়েছে। শ্রেণীহীন সমাজে শুনেছি সে গৌরবশশীর জন্যে কাতর কবিকে প্রলাপ কইতে হবে না, যেন শ্রেণীর বন্ধন উন্মোচিত হলেই বিশেষ নর-নারীর সম্বন্ধ-সমস্যা জলবৎ সহজ হয়ে যাবে, বা উঠবেই না! এই ধারণারই পরিণতি সেই প্রমাদ লেনিন যাকে বলেছিলেন জলের গ্লাসের মতবাদ। এই দৃষ্টিতেই বলা হয় যে ভবিষ্যৎ সমাজে বিবাহ বা বর্তমান বিপ্লবীর বিবাহ যৌন বিবাহ নয়, বৈপ্লবিক বিবাহ! কারণ ডুএরিঙের নির্দেশে প্রেমিককে হতে হবে অমানুষিক—

'The first thing that he must do is to cast off brutality and stupidity now rife in the sphere of sexual union and selection.'

এই একই কারণে তো শিল্পসাহিত্যজগতে এঁদের বর্জননীতির এত দৌরাত্ম্য, ডুএরিঙের মতোই। এদিকে মনে মনে ডুএরিঙের মতোই আছে বাক্‌প্রধান কবিগৌরব। অবশ্য মানিকবাবুরা বলতে পারেন যে তিনি শ্রেণীমুক্ত মানবসমাজের কথাই ভাবেন ও বলেন, যেমন বুদ্ধদেববাবু শ্রেণীহীন ও সমাজহীন মানুষের কথা। কিন্তু শ্রেণীসমাজেও

'there has been on the whole progress in morality, as in all other branches of human knowledge···we have not yet passed beyond class morality. A really human morality which transcends class antagonisms and their legacies in

thought becomes possible only at a stage of society which has not only overcome class contradictions but has even forgotten them in practical life.'

তাছাড়া, প্রগতিবিচারেও রুচির ব্যক্তিগত সমস্যা থেকেই যায়, মায়াকফ্স্কির সেই উটের আর ঘোড়ার মতো :

উটের দিকে তাকায় ঘোড়া,
চেঁচিয়ে বলে, একি বেয়াড়া বাপমাছাড়া ঘোড়া রে।
উট এদিকে জানায়, তুমি তো ঘোড়া নও হে
তুমি চিম্‌সে বেঁটে উট বটে।
এক ঈশ্বর ছাড়া আর কেউই
নক্ষত্রখচিত এই বিরাট ভুবনে জানে না
যে এরা দুটি
স্বতন্ত্র ধরনের দুটি জীব !

৮

আরাগঁ

আরাগঁর বই মাত্রেই সাহিত্যজগতে ঘটনা। দ্রষ্টব্য হচ্ছে আরাগঁর বিশেষ বইয়ের উৎকর্ষের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর কবিপরিণতির স্বাক্ষর। কারণ আরাগঁর কবিজীবন দাদাবাদ থেকে সাম্যবাদের দীর্ঘ কিন্তু প্রাণবান এক বিস্ময়কর বিকাশের উদাহরণ। একনম্বর নরখাদক নামক পুস্তিকায় তিনিই এই কবিতাটি লিখে-ছিলেন : আত্মহত্যা

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W
X Y Z

দারুণ রসিকতা নিঃসন্দেহে, সাবেক ফরাসী অর্থে, বুর্জোয়াদের ক্ষেপাবার জন্যই। কিন্তু এই অক্ষরমালার মধ্যে তৃতীয়টি 'সে' নিয়ে তাঁর বিখ্যাত প্রতিরোধ-কাব্যের একটি জোরালো কবিতাও যে লিখিত, সেটা কি সম্পূর্ণই আকস্মিক প্রেরণা ?

দাদাবাদের আরম্ভ ত্রিস্তাঁ ৎসারা, পল্ এলুয়ার, লুই আরাগঁ প্রভৃতি আজকের অনেক শ্রদ্ধেয় কবিদের তারুণ্যে ; এর ভিত্তি হল জুগুপ্সা বা বীভৎসায়, অস্পষ্ট লক্ষ্য এবং একটু চালিয়াৎও হয়তো, কিন্তু প্রকৃত বিরাগে। অবশ্য তাঁদের মুক্ত লিরিকবাদের তত্ত্বও কার্যকর ছিল না, তা সত্ত্বেও ফরাসীকাব্যের ইতিহাসে দাদার একটা স্থান আছে, অবশ্যব্যর্থ পরীক্ষা হিসেবে, বিদ্রোহের একটা প্রাথমিক খেয়াল হিসেবে। এঁদের মতে শতাধিক বছর ধরে লেখকরা সাহিত্যকে ভেবে এসেছেন নিজেদের একটা বহিরূপায়ণ বলে। এঁদের মতে ধ্রুপদী লেখকদের এ ধারণা ছিল না। তাঁরা তাঁদের শিল্পকর্তৃত্বের ব্যবহারে কল্পনার দ্বারা চেষ্টা করতেন যে প্রত্যক্ষকে যে বাস্তবকে সবাই দেখে তাকেই প্রতিভাত করতে, রূপান্তরিত

করতে। উনিশ শতক ব্যেপে এই বিষয়গত বা অবজেকটিভ এষণা ক্ষীয়মাণ। রোমান্টিকবাদের সময় থেকে লেখকদের ধারণা হল যে তাঁদের সৃজনশক্তি তাঁদের বোধ বা গ্রহণশক্তির আগে। ঈশ্বর হলেন তাঁদের আদর্শ আর জেনেসিস তাঁদের লক্ষ্য। তাই ফ্লোবেয়র তাঁর আপাত-বিষয়ানুগত্য সত্ত্বেও আসলে তাঁর কল্পনার ছায়ামূর্তিদেরই মূর্তিকার। সিম্‌বলিস্ট্‌ বা প্রতীকবাদীরা উলটে সব আদর্শ বা মডেল বিসর্জন দিলেন এবং নিজেদের ব্যক্তিস্বরূপের একটা ডেপুটি বা প্রতিনিধি করলেন তাঁদের কাব্যকে। একালের যুবকদের কাছে তাই র‍্যাঁবোর কীর্তি সূচিত হল তিনি যে এই শিল্পরচনায় প্রতিনিধিত্ব বা প্রতিকৃতির দাবিকে উড়িয়ে দেন, তাতেই, র‍্যাঁবোর দাম তিনি যে শাস্ত আত্মপ্রত্যয়ে—আত্মচিত্রনে নয়, কাব্যের সত্তায় ঝাঁপ দিলেন; তাতেই। র‍্যাঁবোর রচনা তিনি নিজেকে যে একটা রূপ দিলেন তাতেই সম্পূর্ণ। তিনি, কথাটার চলিত অর্থে বলা যায়, লেখেন নি, তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন। সাহিত্যিক কিউবিস্‌ম্‌—আপলিনেয়র, মাক্‌স্‌ জাকব্‌, প্রতীকবাদেরই উত্তর পর্ব, অর্থাৎ আত্মবহিষ্করণই। দাদার ঐতিহাসিক মূল্য এইখানে— এঁরা দেখালেন যে আত্ম-উপলব্ধিতে কিছু উপলব্ধ হয় না, নিজেকে শুদ্ধভাবে বহিরূপায়ণ মানেই লেখকের কাজ শূন্যে অবসিত করা।

দাদাবাদী যখন অতিবাস্তববাদী হয়ে উঠলেন, তখনও তাঁদের মুখ্যত একটা চিন্তা, যদিচ তাঁরা বিরক্ত হয়ে এবারে স্বপ্নজগতের অবচেতনের প্রকৃত কিন্তু অনির্দিষ্ট জগতের মাহাত্ম্যে মাতলেন। আওয়াজ দেওয়া হল: জীবনের বড় সমস্যাসমূহের সমাধানে স্বপ্নজগৎই সারথি। অতিবাস্তববাদ থমকে দাঁড়াল পরিণতির সেই প্রাণময় মোড়ে, যেখানে শিল্প-সাহিত্যের জায়গায় এসে পড়ে বাস্তবজীবন, যেখানে মানুষের কল্পনা শব্দ বা রংরেখার চেয়ে আরো প্রত্যক্ষ বস্তুগত প্রকাশ চায়। অর্থাৎ অতি বাস্তবের আন্দোলন আর সাহিত্যিকগণ্ডিতে থাকে না, জীবনেরই রূপান্তরে তার পরিণতির সততা। লেখককংগ্রেসে তাই ব্রেতঁ বলেছিলেন: জগৎকে বদলে দাও, মার্কস বললেন: জীবনকে পালটাও, র‍্যাঁবোর কথা: আমাদের পক্ষে এ দুটি আদেশবাক্য একই নির্দেশ। এ নির্দেশ আরাগঁই মানেন প্রথম, তিনিই এঁদের প্রথম কম্যুনিস্ট কবি।

তাই ৎসারা তাঁর নতুন বই 'অতিবাস্তববাদ ও যুদ্ধোত্তর যুগ'-এ বলেছেন: 'কাব্য তো ইতিহাসে আকণ্ঠমগ্ন। তাই তাঁর দেসন-র মৃত্যু-গাথা বা লরকাকে উদ্দিষ্ট কবিতা কাব্যের জিজ্ঞাসাও, দেকূরের হত্যার উপরে এলুয়ারের কবিতার মতোই। সৎকাব্য মাত্রেই তো মৌলিক কাব্য জিজ্ঞাসাও বটে।'